জুন, ১৯৯৩

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঈদুয্‌যোহা

ইহুদী চক্রান্তের কবলে মুসলিম উম্মাহ

চির মুসলিম দুশমন ইবনে সাবার উত্তরসূরী ইসমাই–লিয়া আগাখানীদের মুখোশ উন্মোচন

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতাঃ
শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারূকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা
১৮ জ্যৈষ্ঠ–১৪০০
১০ জিলহজ্ব–১৪১৩
১ জুন –১৯৯৩

পৃষ্ঠপোষকঃ
কমাণ্ডার মনজুর হাসান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টাঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্পাদকঃ
মুফ্তী আব্দুল হাই

নির্বাহী সম্পাদকঃ
মনযূর আহমাদ

সহসম্পাদকঃ
হাবিবুর রহমান খান
মুফ্তী শফিকুর রহমান

মূল্য ঃ ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ
সম্পাদক জাগো মুজাহিদ
বি/৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা–১২১৯।
ফোনঃ ৪১৮০৩৯

অথবা
জি, পি, ও বক্স নম্বরঃ ৩৭৭৩
ঢাকা–১০০০

সূচী পত্র

* পাঠকের কলাম ২
* সম্পাদকীয় ৩
* হাদীসের আলোক হজ্ব ও ওমরার ফজিলত ৫
* ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঈদুয্যোহা
  আবূ ইসলাম ৬
* ইয়াহুদী চক্রান্তের বলে মুসলিম উম্মাহ
  আব্দুল্লাহ আল–ফারূক ৯
* ইসলামের চিরদুশমন ইসমাইলিয়া আগাখানীদের মুখোশ উম্মোচন
  মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন ১২
* মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়?
  ইবনে বতুতা ১৬
* আমার দেশের চালচিত্র
  মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন খান ১৯
* কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল
  আল্লাহ্র সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি ২৪
* ধারাবাহিক উপন্যাস
  মরণজয়ী মুজাহিদ
  মল্লিক আহমাদ সরওয়ার ২৭
* কবিতা ৩০
* প্রশ্নোত্তর ৩১
* নবীন মুজাহিদদের পাতা ৩৫
* গল্পঃ একজন কিশোরী ও একটি ক্লাশিনকভ
  উম্মে নাঈম ৩৭
* বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা ৩৯

পাঠকের কলাম

সব রকম বাতিল নিমূর্লে জাতীয় ঐক্য চাই

শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে লং মার্চ বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণ ও ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম নিধন বন্ধের দাবীতে এই ঐতিহাসিক লং মার্চ আন্দোলন কর্মসূচী বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে বিশ্বমানবের বিবেক ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে সম্পূর্ণ সময়োচিত, বিজ্ঞ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় এবং বিশ্বের ১২৫ কোটি তৌহিদী জনতার মর্মপীড়া গভীর আবেগ ও অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। এর গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্বের সচেতন শান্তিপ্রিয় মানব গোষ্ঠীর নিকট অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে।

শ্রদ্ধেয় পীর মাশায়েখ ও আলেম সমাজের নিকট বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির নিরিখে তাদের নিজ নিজ অবস্থান কর্মকাণ্ড আত্মচেতনা ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে এবং শতধা বিভক্ত আত্মকলহে লিপ্ত অমানুষিক বর্বর নির্যাতনের শিকার মুসলিম মিল্লাতের অসহায় করুণ এ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে সঠিক পথ ও পন্থায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্যে আমরা বিশেষভাবে আপনাদের অনুরোধ করছি।

বাতিলপন্থী ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী দলগুলো যদি আজ এক প্লাট ফরমে দাঁড়িয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী চালাতে পারে, তারা যদি পারস্পরিক আকাশ পাতাল প্রভেদ, মত ও পার্থক্য ভুলে এক আওয়াজ উঠাতে পারে, তবে হে গাফেল-আত্মকলহে লিপ্ত মুসলমান। তোমরা কেন এক কলেমা, এক কালাম, এক আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর অনুসারী হয়ে আজ দুশমনদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে আল্লাহ্ পাকের আজাবে ও গজবে গ্রেফতার হয়ে লাঞ্ছিত জীবন যাপন করছো?

এখনো সময় আছে, তওবার দরজা খোলা আছে। আসুন নিজ কৃতকর্মের খেসারত, আত্ম চেতনা বোধ ও আত্মসংশোধনের পথ ধরে ইমান, আমল ও আখলাক দুরস্ত করে বিশ্ব জোড়া ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় বিশ্বের ১২৫ কোটি মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলি। প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যের সর্বপ্রকার আর্থিক, সামাজিক ও অপসংস্কৃতির গোলামীর জিঞ্জির মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসেবে বসবাস করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক আমাদের সহায়।

ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ পুনঃনির্মাণ ও ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান নিধন বন্ধের দাবীতে লং মার্চ কমিটি আহূত লাখো লাখো নিরীহ নিরস্ত্র সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ তৌহিদী জনতার মিছিলে বিনা উস্কানীতে পুলিশের বর্বরোচিত ও কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করার ভাষা আমাদের নেই। এই অমানুষিক নগ্ন হামলায় শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও শত শত নীরিহ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে আমরা দলমত নির্বিশেষে বা সর্বস্তরের জনগণ আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিনের দরবারে সকাতরে বিদগ্ধ হৃদয়ে দোয়া এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এ সংগে নিহতদের পরিবার বর্গের যথোপযুক্ত ক্ষতিপুরন এবং ঘটনার সুষ্ট তদন্ত করে দোষী লোকদের দৃষ্টান্তমূল শাস্তি প্রদানের জন্যে আমরা বর্তমান সরকারের নিকট জোর দাবী করছি। অন্যথায় এর ভয়াবহ পরিণতির জন্য বর্তমান সরকারের প্রশাসনই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী থাকবে।

সভাপতি
ভৈরব অনৈসলামিক কার্য্যকলাপ
প্রতিরোধ কমিটি,
পোঃ ভৈরব,
জেলাঃকিশোরগঞ্জ।

এই ভীরুতার কারণ কি?

সুপ্রিয় সম্পাদক সাহেব!

দরদভরা ভালবাসা জানাচ্ছি। ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করণে, যে কোন সম্পর্ক স্থাপনে, পরিচয় জানার ব্যাপারে লেখনিই উত্তম মাধ্যম। আপনাদের সাথে পরিচয় লাভের সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে আপনাদের প্রিয় পত্রিকা "মাসিক জাগো মুজাহিদ" তথা আপনাদের ক্ষুরধার লেখনি। আল্লাহ্র কাছে এজন্য শুকরিয়া আদায় করছি।

বহু পত্রিকা দেখছি, পড়েছিও। কোনটাই আমাকে জীবনে আকৃষ্ট করতে পারে নি। আমার মন যা খুঁজেছে, আল্লাহ্ তাই-ই দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি চিরদিনই জেহাদী মনা। জাগো মুজাহিদ পত্রিকা আমার আশা পূর্ণ করেছে। এতে যারা লিখেন তারা পণ্ডিত, তাদের পাণ্ডিত্য প্রশংসার দাবী রাখে। জাতির পথ নির্দেশনায় জাগো মুজাহিদ পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম

আপনাদের পত্রিকায় আমার একটি লেখা স্থান পেয়েছিল। আমি মুর্খ, ভাষা জ্ঞান কম। হৃদয়বান বলেই আপনারা আমার অবমূল্যায়ন করেন নি। এজন্য আমি ধন্য, আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সারা বিশ্বের মুসলমানের আজ বিপর্যয়। বিপর্যয়ের মোকাবিলায় জেহাদী মনা সন্তান কোথায় পাব? কোন সূত্র ধরে আসবে? সেই বিচারই এখন বড়। সন্তান যে সব পাচ্ছি বা আসছে, অধিকাংশ তোষামোদ প্রিয়, পদলোভী ও পরকীয়া বৃত্তি সম্পন্ন। মুসলিম ঐতিহ্য তাদের মধ্যে নেই; তারা আতংকগ্রস্থ। জাতি রক্ষায় কাদের পাঠাবেন সমর ক্ষেত্রে? পরাণুকরণে অভ্যস্ত আজকের মুসলমানদের কাছ থেকে একমাত্র মার খাওয়া ছাড়া কি আশা করা যায়? আফসোস্!

এই ভীরুতার কারণ কি? কেন বীর ও বীরাঙ্গণা আজ তৈরী হচ্ছে না? কোন নীতির রমনী দরকার যার গর্ভ হতে খাওলার ন্যায় বীরাঙ্গনা জন্ম নেবে? নেবে শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রঃ)-এর ন্যায়? শরীয়ত বিবর্জিত নারীর কাছ থেকে এটা কি আশাকরা যায়? জ্ঞানী আপনারা, আপনারাই ভেবে দেখবেন।

আজকের মেয়েদের নগ্নতা, রুচীবিহীন আদর্শ অনুকরণের ফল যে শুভ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। নারী স্বাধীনতার নামে চলছে বেহায়াপনা। একে রোধ করার ব্যাপারে জিহাদী কলম চালাতে হবে। মাঠের জিহাদ, ঘরের জিহাদ দুইই দরকার। নারীদের বিশ্রি চলাফেরা আর ইসলামপন্থীদের তথা ইসলামের অপসমালোচনা সহ্য করা দায়। আপনাদের ন্যায় সঠিক পথ নির্দেশক পাওয়ায় এই বয়সে হৃদয়ে প্রেরণা জেগেছে। কলম ধরেছি।

প্রিন্সিপাল এ, এফ, এম সাইয়েদ আহমাদ খালেদ
লক্ষ্মীপাশা,
নড়াইল।

সম্পাদকীয়

ভাগ্য বিপর্যয়ের চূড়ান্ত লগ্নেও আমরা আশাহত নই

বিশ্বে ৫০ টিরও বেশী স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র, বিপুল সম্পদ ও সীমাহীন বিত্তের অধিকারী আরব দেশগুলা আর সোয়া'শ কোটি সদস্যের মুসলিম উম্মাহ বহাল তবীয়তে বিরাজমান থাকাবস্তায় গত ১৩টি মাস যাবত পূর্ব ইউরোপের (সাবেক সমাজতান্ত্রিক অধুনা সমাজতন্ত্র মুক্ত গণতান্ত্রিক রীতি প্রবর্তন প্রয়াসী) মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় যে পশু সুলভ কার্যকলাপ সংঘটিত হলো এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাসের বুকে বসনিয়া একটি গভীর ক্ষত রূপে চিরদিন বেঁচে থাকবে। জ্বলে থাকবে মুসলিম জাতির ললাটে চিরস্থায়ী কলংক টিকা হয়ে।

কেবলমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্য জাতিগুলো, অর্থডক্স খৃষ্টান সার্বরা, ইউরোপ ও আমেরিকার সকল শক্তির নীরব সমর্থনে জাতিসংঘের কৌশলগত পৃষ্ঠপোষকতায় বসনিয়ার দুই লক্ষ মুসলমানকে পৈশাচিক প্রক্রিয়ায় হত্যা করেছে। নির্মম নির্যাতন করে, জীবন্ত লাশে পরিণত করেছে ষাট লক্ষাধিক মুসলিম মা-বোন ও মেয়েকে। দশ লক্ষাধিক মুসলিম আবাল বৃদ্ধ বণিতা এখন তাদের বাস্তু ভিটে ছেড়ে স্রোতের শেওলার মতো বন্যার তোড়ে ভাসছে। অনেকেই সার্বীয় বন্দীশালার নিপীড়ন সেলে অপেক্ষা করছে "সুখের মরণ কবে আসবে"।

জাতিসংঘ নামক মুসলিম জাতির চরম দুশমন সংস্থাটির সর্বোচ্চ আসনটিতে অধিষ্ঠিত মিসরীয় আরব বংশোদ্ভুত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক কিবতী খৃষ্টান, কুখ্যাত কূটনীতিক বুট্রোস ঘালি পরম নিষ্ঠা আর কৌশলের সাথে ইউরোপকে মুসলিম শূন্য করার হীন চেষ্টায় রত। বসনীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীটিকে নির্বংশ করে দেয়ার পর হয়ত পশ্চিমা নেতারা বুট্রোস ঘালিকে শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করবেন।

গত ১৩/১৪ মাস যাবত বসনীয়দের সাহায্য করা, তাদের উপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া, খুনী ও ধর্ষণকারী সার্বদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন করা ও সার্বীয় সীমালংঘনের ব্যাপারে মার্কিন এবং মিত্রশক্তির হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে কেবল আলোচনা বৈঠক, প্রস্তাব আর প্রচারণাই হতে থাকলো। বিশ্বের মানবাধিকার ও ন্যায়-নীতির ধ্বজাধারীরা যেন অপেক্ষায় রয়েছেন; কোনদিন এ সংবাদটি আসবে যে, বসনিয়ায় আর কোন মুসলমান নেই। এর পরই তারা সেখানে মানবাধিকার ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়বেন।

ইতিমধ্যে অবশ্য সে সময়টি ঘনিয়ে এসেছে। একে একে প্রায় সব ক'টি বসনিয় প্রধান শহর সার্বদের হাতে চলে গেছে। আর দু' একটা জায়গার পতন হলে সব ঝামেলা চুকে যাবে।

ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ বিচ্যুত, ঈমানী শক্তি হারা, বিলাসী, হীনমন্য ও পাশ্চাত্যের সেবাদাস মুসলিম নেতৃবর্গের মোটা চামড়ায় বসনিয়া ট্রাজেডী দাগ কাটতে না পারলেও মুসলিম উম্মাহর নিরীহ সদস্য আর সাধারণ মুসলমানদের হৃদয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এঁকে দিয়েছে বিশাল ক্ষতের আগ্নেয় উল্কি। এই রক্তাক্ত ঘা সহজে শুকানোর নয়।

আমাদের জানা নেই, পূর্ব ইউরোপে অনুষ্ঠিত ঈমানের এই অগ্নি পরীক্ষার ফলাফল কী ধরণের বারতা নিয়ে মুসলিম জাতির উপর ফিরে আসবে। ধ্বংস, পতন, শাস্তি ও আযাবের বাণী নিয়ে? নাকি পুনরুত্থান, স্বস্তি আর মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আশ্বাস বহন করে? কারণ হতাশা ও নৈরাশ্য ঈমানের বিপরীত জিনিস। অন্ততঃ শেষনবী (সাঃ)-এর উম্মতের দাবী নিয়ে হলেও আমাদের আশাবাদী হতে হবে। কেননা আল্লাহর রহমত আমাদের সকল অপারগতা, ঔদাসীন্য ও অপরাধের চেয়ে অনেক অনেক ব্যাপক।

'জাগো মুজাহিদ'-এর নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✪ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✪ এজেন্সীর জন্য অগ্রীম বা জামানত পাঠাতে হয় না।
- ✪ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়।
- ✪ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✪ অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না।
- ✪ ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

২. বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিষ্ট্রি ডাক)

✪ বাংলাদেশ	একশো চল্লিশ টাকা
✪ ভারত ও নেপাল	ছয় ডলার
✪ পাকিস্তান	আট ডলার
✪ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা	পনের ডলার
✪ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	পনের ডলার
✪ ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া	আঠার ডলার

সাধারণ ডাকে গ্রাহক করা হয় না।

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✪ গ্রাহক হবার জন্য ব্যাংক ড্রাফট ও চেক 'মাসিক জাগো মুজাহিদ' নামে পাঠাতে হয়। দেশের অভ্যন্তর থেকে মানি অর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের যোগাযোগের ঠিকানায়

ব্যাংক একাউন্ট

মাসিক জাগো মুজাহিদ
কারেন্ট একাউন্ট নং-৫৩১৯
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
লোকাল ব্রাঞ্চ, মতিঝিল, ঢাকা

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি-৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

হাদীসের আলোকে হজ্ব ও ওমরার ফজিলত

হজ্ব কার ওপর ফরজঃ হযরত আলী (রাঃ) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যার কাছে হজে সফর করার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় আছে এবং বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছাতে পারে এমন যানবাহনেরও ব্যবস্তা আছে, সে যদি হজ্ব না করে তবে তার ইহুদী হয়ে মৃত্যু বরণ করা ও খৃষ্টান হয়ে মৃত্য বরণ করার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ্র জন্য বায়তুল্লাহ্র হজ্ব ফরজ তাদের ওপর যারা সে পর্যত যাওয়ার সামর্থ রাখে।" (তিরমীযি, মা'আরেফ)

ওমরার স্বরূপঃ হজ্বের মতই অন্য একটি এবাদত হল ওমরাহ। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এর স্বরূপ হজের কতক প্রেমিক সূলভ ক্রিয়াকর্ম। তাই একে হজ্বে আসগর (ছোট হজ্ব) বলা হয়।

হজ্ব ও ওমরার ফজিলতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'হজ্ব ও ওমরা একসাথে কর। উভয় এবাদত দারিদ্র ও গোনাহকে এমনভাবে দূর করে, যেমন কর্মকার ও স্বর্ণকারের গরম পানিপূর্ণ পাত্র লোহা ও সোনারূপার আবর্জনা দূর করে দেয়। আর হজ্বে মাবরুর তথা মকবুল হজ্বের প্রতিদান ও ছওয়াব তো জান্নাতই।" (তিরমিযী, নাসায়ী, মা'আরেফ)

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "হজ্ব ও ওমরার জন্যে গমণকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র বিশেষ মেহমান। সে দোয়া করলে আল্লাহ্ কবুল করেন, ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করেন।" (তিবরানী, মা'আরেফ)

নবী করীম (সাঃ) আরও বলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যহ তাঁর হাজী বান্দাদের জন্যে ১২০টি রহমত নাজিল করেন। তন্মধ্যে ৬০টি রহমত তাদের জন্য যারা বায়তুল্লাহর তওয়াফ করে, ৪০টি তাদের জন্য যারা সেখানে নামাজ পড়ে এবং ২০টি তাদের জন্য যারা কেবল কাবাকে দেখতে থাকে।" (বায়হাকী)

অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ৫০ বার বায়তুল্লাহর তওয়াফকরে নেয়, সে গোনাহ থেকে এমন পাক হয়ে যায়, যেন আজই ভূমিষ্ট হয়েছে।" (তিরমিযী)

এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাসূল (সাঃ) বলেন, "আরাফার দিনে যখন হাজিগণ আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে গর্ভ করে বলেন, আমার বান্দাদেরকে দেখ, দূর-দূরান্ত থেকে তারা আমার কাছে এসেছে। তাদের কেশ বিক্ষিপ্ত এবং দেহ ধুলি ধূসরিত, তারা রৌদ্রের মধ্যে চলাফেরা করছে তোমরা সাক্ষী থেক, আমি তাদের ক্ষমা করলাম।' (বায়হাকী, ইবনে খুযায়মা)

হযরত বিবি উম্মে ছালমা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদাছ হতে (মক্কার) বায়তুল হারামের দিকে হজ্ব বা উমরাহর এহরাম বাঁধবে তার পূর্বাপরের গোনাহ মাফ করা হবে অথবা তিনি বলণেঃ তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।" (আবু দাউদ, ইবনু মাজা)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "হজ্ব ও উমরা সাথে সাথে কর। কেননা তা দারিদ্র ও গোনাহ দূর করে যেভাবে হাপর লোহা এবং সোনারূপার ময়লা দূর করে কবুল করা হজ্বের ছওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ কোন্ আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, "আল্লাহ্ ও তার রাসূলের ওপর বিশ্বাস রাখা।" অতপর জিজ্ঞাসা করা হল, তার পর কি? তিনি বললেন, "আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলঃ তার পর কি? তিনি উত্তরে বললেন, "কবুল করা হজ্ব।" (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্ব করেছে এবং তাতে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি সে হজ্ব হতে ফিরবে সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।" (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্র যাত্রী হল তিন ব্যক্তি; হাজী, গাজী ও উমরাহকারী। (নাসায়ী, বায়হাকী, তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাঞ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্ব, উমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নিয়মে বাহির হয়েছে অতঃপর ঐ পথে সে মারা গিয়েছে তার জন্য গাজী, হাজী বা উমরাকারীর সওয়াব লেখা হবে।" (বায়হাকী, তিরমিযী)

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঈদুয়যোহা

আবু ইসলাম

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সামনে ত্যাগ ও নিবেদিত প্রাণের স্মৃতি বিজড়িত কোরবানীর ঈদ উদযাপিত হয় বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে। কোরবত শব্দ থেকে কোরবানী। কোরবত অর্থ নৈকট্য। পশু জবেহর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা হয় বলেই একে কোরবানী বলা হয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশকে ইবরাহীম (আঃ) অধিক গুরুত্ব দেন না তাঁর কাছে নিজের সন্তানের মমতাই বড়, এ পরীক্ষা নেয়ার জন্যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় পুত্রকে আল্লাহ্‌র নামে জবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) সেই ঈমানী পরীক্ষায় যথাযথ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পুত্রের গলায় চালিয়েছিলেন ধারালো ছুরি।

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ইবরাহীমের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে বধ করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়-তিনি ইবরাহীম (আঃ) থেকে যা চেয়েছিলেন, তা পেয়ে গেছেন। তাই ধারালো ছুরির কর্তন-শক্তি তিনি রহিত করে দিলেন! ছুরি ইসমাঈলের একটি পশমও কাটলো না। হযরত ইবরাহীমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বললেন, তোমার ঈমানের পরীক্ষা হয়ে গেছে—তুমি সফল। তুমি ঈমানী দাবীর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছ।

তবে মানব ইতিহাসে আল্লাহ্‌র এহেন একটি কঠোর নির্দেশ পালনের এত বড় ত্যাগের ঘটনা এভাবে কালের স্রোতে ভেসে যাবে, এটা আল্লাহ্ চাননি। তিনি এ ঘটনাকে পরবর্তীদের জন্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ত্যাগের প্রেরণা হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে যাতে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি তাঁর জন্যে ত্যাগের এ ঘটনাকে অনুপ্রেরক করে রাখলেন। এর বিকল্প হিসাবে প্রতীকী ব্যবস্থা স্বরূপ পশু কোরবানীর নির্দেশ দিলেন। এখন পুত্র নয়-পশু কোরবানীর মধ্য দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) ত্যাগের শিক্ষাকে স্মরণ করে কেউ নিজ জীবন ও চরিত্রকে আল্লাহ্‌র অনুগত করে গড়ে তুলতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের দ্বারা তার জন্যে উন্মুক্ত। তা না করে শুধু গোশ্‌ত খাবার ইচ্ছা কিংবা আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা সেটা অর্জন সম্ভব হবে না।

কোরবানীর মুল ইতিহাস সৃষ্টিকারী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও সংগ্রামী ভূমিকা যেন কোরবানীদাতা ভুলে না যায়, সে জন্যে পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, "তোমরা ইবরাহী-মের গোটা সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিমন্থন করো। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি যে ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দিয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও ন্যায়ের ওপর অটল থেকেছেন, তোমাদেরও একই ভূমিকা নিতে হবে।

কোরবানীর পশু মোটা-তাজা ও সুদর্শন হওয়া উচিত। হাদীসে এর মাধ্যমে পুলসিরাত পার হবার যে কথাটি বলা হয়েছে, সেটি হয়ত রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ কোরবানীর অনুষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা ও সে অনুযায়ী নিজের জীবন ও চরিত্র গঠনের দ্বারা সহজ পন্থায় পুলসিরাত পার হবার ব্যবস্থা হবে। কোরবানীর ক্ষেত্রে অধিক মূল্যের পশু হওয়া ইত্যাদি কিছুর মধ্য দিয়ে আসলে বিষয়টির প্রতি কোরবানীদাতার হৃদয়ে গুরুত্বের প্রতিই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যাদের কোরবানীর পশু ছোট যেমন কেউ খাসি কোরবানী দিয়েছে, তাহলে কি তার ওপর গরু কোরবানীদাতারা অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার হয়ে গেল? আর যদি ঐ পশুই পুলসিরাত পার হবার বাহন হবে, তাহলে একটির উপর সাত শরীকদার সওয়ার হবার স্থান কোথায়? এ ছাড়া যাদের উপর কোরবাণী ওয়াজিব নয়, তাহলে তাদের পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যাবার উপায় কি? আসল কথা হচ্ছে তাই যা ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হলো। আল্লাহতায়ালার কাছে পশুটিই যে বড় কথা নয়, তার বড় প্রমাণ হলো তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে কোরবানীর গোশত রক্ত কিছুই পৌছুবে না-পৌছুবে শুধু কোরবানী থেকে লব্ধ তাকওয়া' অর্থাৎ তাকওয়ামণ্ডিত চরিত্রের কর্মফল।" (সূরা হাজ্জ)

আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থার ফলেই ইবরাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় গায়রুল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা হিসাবে সর্বশক্তিমান। কাজেই স্রষ্টার ইচ্ছা না হলে সম্রাট নমরূদের অগ্নিকুণ্ডের আগুনও দাহন শক্তিহীন হতে বাধ্য। বস্তুতঃ নমরুদের অগ্নিকুণ্ড নাতিশীতোষ্ণে পরিণত হবার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই বিশ্বাসেরই বাস্তব ফলশ্রুতি মিলেছে। আজ এ দিনেও ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে এবং দ্বীনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে হলে একজন মুমিনকে যেমন অনুরূপ ঈমানী দৃঢ়তার শক্তিশালী হতে হবে, তেমনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মতো বাতিল ও তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে হতে হবে আপোষহীন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মানব মনের

দুর্বলতার উৎস শিরক তথা গায়রুল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার উপর মানুষের আস্থার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল এবং এই শক্তির মূল আধার আল্লাহ্‌র ওয়াহ্‌দানিয়াতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিজ সমাজে। কারণ আল্লাহ্‌র ওয়াহদানিয়াতের উপর আস্থাই মানুষকে দুর্জয় শক্তির অধিকারী করতে পারে এবং মানব সমাজের তওহিদী ঐক্যই আনতে পারে শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। বস্তুতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এভাবেই চেয়েছিলেন ইরাককে কেন্দ্র করে আল্লাহ্‌র জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা একটি সুখী-সুন্দর, শোষণমুক্ত আল্লাহ্‌ভক্ত সমাজ গঠন করতে, আর তৎকালীন ইরাক অধিপতি নমরূদ তারই বিরোধিতায় খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। তাই মহাত্যাগী নবীর স্মৃতিবিজড়িত কোরবানী হযরত ইবরাহীমের আদর্শের যথার্থ অনুসরন ছাড়া কিছুতেই সফলতা বয়ে আনতে পারে না। প্রতি বছর কোরবাণী উপলক্ষ্যে কোটি কোটি মানুষ পশু কোরবানী করা সত্ত্বেও কোরবানীর সেই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত না হবার মুল কারণ এখানেই নিহিত।

যুগ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এ জগতে মানব সমাজে আল্লাহ্‌র বহু প্রেরিত পুরুষ অতীত হয়ে গেছেন। তাদের কারুর উপরই মানবজাতির পরিপূর্ণ বিধান অবতীর্ণ হয়নি। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-ই এ সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্‌র এই পরিপূর্ণ বিধান মানব সমাজে কার্যকর ও প্রয়োগ একটি কষ্ট ও সংগ্রাম সাধ্য কাজ। এ কাজে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি জুলুম, নিপীড়ন। এজন্যে প্রয়োজন রয়েছে মস্তবড় ত্যাগের। বস্তুতঃ এ কারণেই অপর কোন নবীর বিশেষ কোনো আদর্শকে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর পালনীয় না করে হযরত ইবরাহীমের মহাত্যাগের আদর্শ অনুসরণকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌ জানেন, আল্লাহ্‌ পরিপূর্ণ জীবন বিধান মানব সমাজের প্রতিষ্ঠার দুরূহ ও কষ্টসাধ্য কাজটিতে চরম ঈমানী পরীক্ষার মুহূর্তে একমাত্র ইবরাহীমী ত্যাগের স্মৃতিই উম্মতে মুহাম্মদীর মস্ত বড় পাথেয় হতে পারে। আমাদের সমাজ তথা গোটা বিশ্ব-মানবগোষ্ঠী আজ অশান্তির কবলে নিপতিত। সর্বত্রই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মানব সমাজের উপর নমরূদী মনোবৃত্তির প্রভুত্ব চলছে, যদ্দরুন মানুষ আজ অন্যায়-অবিচার শোষণ-নিপীড়নের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। মানবতাকে এ দুর্বিসহ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে প্রতিটি ঈমানদার কোরবানীদাতার ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনী চেতনা ও ত্যাগের স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে আসা কর্তব্য। মুমিন-আত্মার ঈমানী শক্তির নতুন উদ্বোধন ঘটাবার জন্যে কোরবানী অনুষ্ঠান প্রতি বছর আমাদেরকে এই আহবানই জানিয়ে যায়।

বস্তুতঃ নিজের কামনা-বাসনা, ব্যক্তিগত, কষ্টার্জিত সম্পদ ও প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সামনে সমর্পণের উদার আহবান নিয়েই প্রতি বছর কোরবানীর ঈদ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কোরবানী একদিকে যেমন ত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী; মহান নবী ইবরাহীম (আঃ)-এর ত্যাগদীপ্ত সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে জাগিয়ে দেয়, তেমনি প্রতিটি মুমিন অন্তরকে ঈমানী চেতনায় করে তোলে উজ্জীবিত। ঈদুল আযহার দিনে কোরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালাবার পূর্বাহ্নে কোরবানীদাতা যখন উচ্চারণ করেন;

"আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার বেঁচে থাকা, মৃত্যু বরণ সব কিছু বিশ্ব—প্রতিপালকের জন্যে"-এ কথার দ্বারা একজন কোরবানীদাতা মূলতঃ নতুন করে আল্লাহ্‌র সাথে এই অঙ্গিকারেই আবদ্ধ হয় যে, হে খোদা! হযরত ইবরাহীম (আঃ) যেভাবে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার বাধাবিপত্তি, অমানুসিক জুলুম-নিপীড়নকে উপেক্ষা করে তোমার নির্দেশের উপর অটল ছিলেন এবং বাতিলের সাথে আপোষ না করে সামাজিক বয়কট ও রাষ্ট্রীয় চরম দণ্ড অগ্নিকুণ্ডে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়ে নিজের জীবনকে নির্মম মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে ইতস্ততঃ করেননি, আমিও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এজন্যে যদি আমাকে তাঁর মতো দেশান্তরিত হতে হয় তাও রাজি আর যদি রাষ্ট্রীয় রোষাণলে পড়ে জেল-জুলুম এমনকি নির্মম প্রাণদণ্ডাদেশের ন্যায় চরম নির্দেশও শুনতে হয়, সেজন্য আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত। এছাড়া আমার যেই প্রিয়তম সন্তান আমি নিজের প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসি, তোমার নির্দেশকে সকল কিছুর উপর তুলে ধরতে গিয়ে যদি তারও প্রাণ নাশ বা প্রাণহারার মত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে অবস্থাকেও আমি হাসিমুখে মেনে নিতে প্রস্তুত। তেমনিভাবে তোমার পথে চলতে গিয়ে যদি প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা কোনো স্বামীই মেনে নিতে রাজি নয়, আমি অনুরূপ পরিস্থিতিতেও তোমার দ্বীনের স্বার্থে রিষ্টচিত্তে তা করে যাবো।

বলাবাহুল্য, প্রতি বছর কোরবানী অনুষ্ঠানের মধ্য নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে কোটি কোটি পশু যবেহর যদি এটাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশকে সকল কিছুর উপর বলবৎকরার জন্যে মুমিন অন্তরে নতুন প্রেরণা সঞ্চারের জন্যে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়, তা হলে ঐ মহান লক্ষ্য আমাদের সমাজে কতদূর পালিত হচ্ছে? কোরবানী অনুষ্ঠানের এদিনে প্রতিটি কোরবানীদাতাকে সেই আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হতে হবে। অন্যথায় এই কোরবানী আপন আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শুধু গোশত ভক্ষণেরই একটি উৎসবে রূপান্তরিত হবে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে আল্লাহ্ তায়ালা যেই উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন, তার স্বাভাবিক দাবী হলো, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং তাঁর জীবনের শিক্ষা আদর্শকে নিজেদের চলার পথের মশালে পরিণত করা। আল্লাহ্ তায়ালা এ জন্যেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সত্যের উপর আপোষহীন দৃঢ়তা ও অটল ভূমিকার প্রশংসা করার সাথে সাথে বলেছেন, "ঘোষণা করে দাও আল্লাহ্ যা বলেছেন যথার্থই বলেছেন। তোমাদের উচিত নির্দ্বিধায় ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করা আর ইবরাহীম শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" –(আলে–ইমরান)

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেনঃ

(১) "হানীফ", অর্থ–তিনি আল্লাহ্র প্রভুত্বে ছিলেন দ্বিধাহীন এবং তাঁর দাসত্ব পালনে ছিলেন একাগ্রচিত্ত। ইবরাহীম (আঃ)–এর গোটা জীবনই এ কথার সাক্ষী যে, তিনি আল্লাহ্র খাতিরে গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র আল্লাহ্র খাতিরেই নিজ পিতাকে ত্যাগ করেছেন। নিজ সমাজকে ছেড়েছেন। আল্লাহ্র আনুগত্য করতে গিয়েই তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে নিজের বাড়িঘর, আরাম–আয়েশ । আল্লাহ্র দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যেই তাঁকে নিজ জন্মভূমি ইরাকের 'উর" থেকে ফিলিস্তীনে, মিসরে এবং হেজাজে যেতে হয়েছে। যখন আল্লাহ্র নির্দেশ হলো নিজের প্রিয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হলেন। মূলত তিনি তো তাঁর ইচ্ছামত পুত্র ইসমাঈলকে যবেহ করেই ফেলেছিলেন, এটা আলাদা কথা যে, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্র খাতিরেই তিনি আপন স্ত্রী এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নির্জন বাস দিয়ে এসেছেন। এক কথায় এমন কোনো ত্যাগ কোরবানী তিনি বাকি রাখেননি যা আল্লাহ্র জন্যে নিবেদন করেননি।

(২) তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো এই যে, জীবনের কোনো পর্যায়ে এমনকি মহাসংকটের মুহূর্তেও তিনি আল্লাহ্র প্রতি আস্থায় দ্বিধাস্থিত হননি। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে যেমন তাঁর কোন দ্বিধা–সংশয় ছিল না, তেমনি আল্লাহ্কেই তিনি মনে করতেন সর্বশক্তির আধার এবং একমাত্র মুক্তিদাতা। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করাই ছিল ইবরাহীম (আঃ)–এর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি মুমিন বান্দার মধ্যে সেই ইবরাহীমী গুণাবলী ও ঈমানী দৃঢ়তাই দেখতে চান। একারণেই মহাত্যাগী ইবরাহীম (আঃ)–এর সংগ্রাম জীবনের অনুসরণ করার জন্যে তিনি সূরা আলে–ইমরানের উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সকলকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেই আহবানে কতদূর সারা দিচ্ছি? প্রতি বছর কোরবানী আসে কোরবানী যায়, আমাদের ব্যক্তি সমাজ ও সামগ্রিক মুসলিম উম্মাহর জীবনে তার কি প্রতিফলন ঘটছে।

পদে পদে আজ আমরা আপন প্রবৃত্তির পূজা করে যাচ্ছি। ন্যায়, অন্যায়, হালাল, হারাম, হক না হক–কোনো কিছুরই আমাদের মধ্যে আজ তমিয নেই। একদিকে দুর্নীতি, অসাধুতা আমাদের ছেয়ে ফেলেছে, অপর দিকে আমরা প্রকাশ্যে ইবরাহীম (আঃ)–এর অনুসৃত নীতি–আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করছি। সামান্য অর্থ, সামান্য জমিন, সামান্য পদমর্যাদা ও খ্যতির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বাতিলের সাথে আপোষ করা, অসত্যের আশ্রয় নেয়া, অসত্যের কাছে মাথা নত করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। মুমিন সুলভ দৃঢ়তা ও সৎসাহস হারিয়ে গেছে। সত্য পথ, সত্য মত ও সত্য কথনকে মনে করা হচ্ছে জীবন উন্নয়নের অন্তরায়। চাতুর্য, অসাধুতা, কথাকর্মের বৈপরীত্য ও ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক চিন্তা আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে যে, আমরা এখন প্রায় সব কিছু বৈষয়িক স্বার্থের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফলে ন্যায়নীতি বিদায় নিয়েছে, তেমনি সমষ্টিগত জীবনের অবস্থাও ইবরাহীমী শিক্ষার মাপকাঠিতে সম্পূর্ণ অবর্ণনীয়। গোটা উম্মতের মধ্যেই যেন এক ঘুণে ধরা অবস্থা বিরাজমান।

বলা বাহুল্য, এভাবে কোনো উম্মতের মধ্যে যখন সামগ্রিকভাবে ঈমানী দৃঢ়তা সম্পন্ন লোকের অভাব দেখা দেয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে এক দিকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও পারস্পরিক হানাহানির সূত্রপাত ঘটে, অপরদিকে দুনিয়ার বাতিলপন্থী নমরূদদেরও দৌরাত্ব বেড়ে যায়।

মুসলিম সমাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ ইতিহাসের ঠিক এমন এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রায় একই অবস্থান, বিধান ছাড়াও তাদেরকে দান করেছেন প্রাকৃতিক বহু সম্পদ। তারা ইবরাহীমী ঈমান বলে বলীয়ান হয়ে নিজ নিজ দেশ থেকে নমরূদী বিধিবিধান, ধ্যান–ধারণার উৎখাত করে যদি খোদায়ী ন্যায়–বিধান প্রতিষ্ঠা করতো তাহলে যেমন নিজেদের মধ্যে এত সব আত্মকলহ থাকত না, তেমনি বিজাতীয় কোন নমরূদী শক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে বোসনিয়া বা কাশ্মির কোথাও নিজেদের দন্ত নখরাঘাতে মুসলিম জনপদকে ক্ষতবিক্ষত করতে সাহসী হতো না। মৃত্যুর ভয়ে ঈমানী দুর্বতায় আড়ষ্ট মুসলমান আজ যেমন সকল দিক থেকে নিজের বাসভূমিতে অসহায় বোধ করে, তেমনি নমরূদী বহিঃশত্রুর ভয়ে তারা শংকাগ্রস্ত। আল্লাহ্ না করুন, এ অবস্থা আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে মুসলমানদের নিজ ভূমিতে অবস্থানও কঠিন হয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

আমরা যে মুহূর্তে প্রতি বছর পশুর গলে ছুরি চালিয়ে ঈদুল আযহার কোরবানী

(২৩ পৃঃ দেখুন)

ইহুদী চক্রান্তের কবলে মুসলিম উম্মাহ

আবদুল্লাহ আল-ফারুক

বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, ইসলামের উত্থানের পর থেকেই মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদী চক্রের যে অব্যাহত চক্রান্ত চলে আসছে তা' ব্যাপকভাবে ও কার্যকররূপে শুরু হয় ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর সময় থেকে। এর পুর্বেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় হিযরত করলে ইহুদীরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মুসলমানদের মদীনা থেকে উৎখাত করার জন্য মক্কার কুরাইশদের সাথে গোপনে জোটবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর দূরদর্শিতার ফলে তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে তাদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। বহিষ্কৃত হওয়ার পর ইহুদীরা বার বার রাসুল (সাঃ)ও সাহাবীদের ধ্বংস করার চক্রান্তে মেতে থাকে। তাদের সেই চক্রান্ত ধ্বংসাত্বক রূপে নিয়ে প্রথম বারের মত মুসলিম উম্মাহর বুকে আঘাত হেনেছে তৃতীয় খলিফার খেলাফতের সময়ে। ইহুদীদের চক্রান্তের ফলে খলিফা শাহাদাত বরণ করেন, পরবর্তিতে ভ্রাতৃঘাতী ও রক্তক্ষয়ী জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফ্ফিন সংঘটিত হয়েছে। ইহুদী চক্রান্তের জের ধরেই বিশ্ব বুকে সংঘটিত হয়েছে মর্মান্তিক-কারবালাট্রাজেডী—ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা। এই ইহুদী চক্রের নায়ক ছিলো ইয়ামেনের ইহুদী বংশোদ্ভুত নও মুসলিম ছদ্মবেশী ইহুদী পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। এই ইহুদী কুচক্রী মুসলমানের ছদ্মবেশে মুসলিম সমাজে ভাংগন ও বিরোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার আমলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার দূর্তামী ও শঠ চরিত্রের জন্য তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। তৃতীয় খলিফার সময় এই লোকটি অতীতের সকল চারিত্রিক দোষ সংশোধন করেছে এমন ভান করায় খলিফা সরল বিশ্বাসে তাকে ইসলাম গ্রহণের অনুমতি দেন।

ইবনে সাবার চক্রান্তের ফলে ও তার সুক্ষ্ম প্রচারণার কারণে মুসলিম সমাজে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে সৃষ্টি হয় শিয়া সম্প্রদায়। ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মিশরে ফাতেমীয় শিয়া রাজবংশের শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পেছনেও রয়েছে সূক্ষ্ম ইহুদী চক্রান্ত। খৃষ্টান ধর্মকে বিকৃত করে "ত্রিত্ববাদ" কায়েম করার পেছনেও রয়েছে ইহুদীদের অবিস্মরণীয় (!) অবদান। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর লাশ মুবারক চুরি করে অমর্যাদা করার এক দুঃসাহসিক ব্যর্থ চক্রান্ত করেছিল পাশ্চাত্যের এই ইহুদীরাই। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক বিপর্যয়ে এই ইহুদীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে ওই সেই থেকে।

ইসা (আঃ) কে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টার জন্যও দায়ী এই ইহুদীরাই। এ কারণে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান যুব সমাজ কর্তৃক যুগে যুগে নির্মূল-যজ্ঞ কাণ্ডের শিকার হয়েছে। কথিত যিশু হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ খৃষ্টান বিশ্ব যুগ যুগ ধরে ইহুদীদের অলিতে গলিতে, রাস্তায়, বস্তিতে যেখানে পেয়েছে হত্যা করেছে। যিশু হত্যার প্রতিশোধ, মজ্জাগত শঠতা ও ধূর্তামী স্বভাব ও কুচক্রী জাতি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় খৃষ্ট পূঃ ৫৮৭ সালে বখত নছর বাদশাহ জেরুজালেমের ইহুদীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেন। ৭০ খৃঃ রোমানরা একই কারণে ইহুদী নিধনে ব্রত হয়। উল্লেখিত ত্রিবিধ কারণ ছাড়াও ইউরোপ মহাদেশের ইংল্যাণ্ড থেকে ১২৯০ সালে, ১৩৭০ সালে বেলজিয়াম, ১৩০৬ ও ১৩৯৪ সালে দুই পর্যায়ে ফ্রান্স থেকে, ১৩৮০ সালে পূর্বের যুক্ত চেকোস্লাভাকিয়া, ১৪৪৪ সালে হল্যাণ্ড, ১৫৪০ সালে ইতালী, ১৫১০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৫৫১ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে হিটলার কর্তৃক জার্মানী থেকে ইহুদী সম্প্রদায়কে বহিষ্কার করা হয়।

এভাবে কুচক্রী ইহুদী সম্প্রদায় তাদের কার্যকলাপের জন্য বিশ্বের সকল জাতি কর্তৃক বিতাড়িত, নির্যাতিত, নিপীড়িন ও গণহত্যার মুখোমুখি হলেও ইউরোপের মুসলিম স্পেন ও তুর্কী সুলতানদের উদারতার কারণে তারা এই রাষ্ট্র দু'টিতে শুধু নিরাপদ আশ্রয়ই পায়নি সম্মানীত বড় বড় পদেও অধিষ্ঠিত হয়। আধুনিক যুগে যেমনি ইসরাঈল তথা ইহুদীরা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার আশ্রয়ে থেকে বিশ্বময় মানবতা বিধ্বংসী যাবতীয় কার্যাবলী চালিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দাপটের সাথে, তখনও ইহুদীরা মুসলিম শাসকদের উদারতার সুযোগে মুসলিম সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় একই ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। ইহুদী জাতির অস্তিত্ব যখন হুমকীর সম্মুখীন, খৃষ্টানদের হত্যাযজ্ঞের ফলে পৃথিবী থেকে ইহুদীদের নাম নিশানা মুছে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন তখন একমাত্র যে মুসলিম জাতি তাদের আশ্রয় দিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায় অকৃতজ্ঞ ইহুদীরা সেই মুসলিম জাতিকেই ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যে অপচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে।

বিশ্বের ইতিহাসে ইহুদী জাতি বিশ্বাসঘাতক ও সততা বিরোধী, সত্যকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দশজন এবং

দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের দশপুত্র ঈর্ষাপরায়ণ ও প্রতিহিংসাবশত সৎ ভাই ও পিতার আদরের দুলাল ইউসুফ (আঃ)–কে চক্রান্ত করে মারার জন্য কুপে নিক্ষেপ করেছিল। পরে তারা তার জামা কাপড় পশুর রক্তে রঞ্জিত করে পিতার নিকট হাজির করে বলেছিল যে, ইউসুফ (আঃ)কে বাঘে খেয়েছে। আপন ভাইয়ের সাথে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী ইয়াকুব (আঃ)–এর এই দশ পুত্রের পরবর্তী বংশধররাই ইতিহাসে 'ইসরাঈল' নামে পরিচিত।

এই ইসরাইলী ও পরে ইহুদী নামে পরিচিত সম্প্রদায় তাদেরকে সত্যের পথে আহবান করার জন্য যে কজন নবী তাদের মধ্যে আগমন করেছিলেন তাদের সকলের নির্দেশ লংঘন করে তাদের সাথে গোড়ামী, বেয়াদপী, মিথ্যা অপবাদ প্রদান করে এবং তাদের নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপন করেছিল। ইতিহাসকে এরাই কয়েক হাজার নবীকে হত্যার জন্য দায়ী। ইহুদীরা ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের আসমানী কিতাব তাওরাতের ইচ্ছেমত পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়ে স্বার্থ উদ্ধার ও ধন সম্পদ অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত করে। রাসুল (সাঃ)–এর নবুয়াত লাভের পর দৈনন্দিন এদের শঠতা, ধূর্ততা ও মোনাফেকী চরিত্রের রূপ সম্পর্কে ওহী নাজিল হতে থাকলে ইহুদীরা তখন মুসলমানদের কঠিন শত্রুতে পরিণত হয়। তাদের ইসলামের দাওয়াত জানালে তারা প্রত্যুত্তরে গোড়ামী করে বলে, "এতো সেই জিবরীল যে চিরদিন আমাদের বিরুদ্ধে ওহী বহন করে এনেছে।" তারা ইসলাম গ্রহণ না করে বরং ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ইসলামের অভ্যুদয় থেকে ইহুদীদের ইসলামের সাথে সেই যে শত্রুতার সূচনা, মুসলমানদের ধ্বংস করার চক্রান্তের জাল বুনোন শুরু তা আর কোন দিন থামেনি, বরং যুগে যুগে ইহুদী চক্রান্ত আরও শানিত হয়েছে, নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

তৃতীয় খলিফার মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার পর ইবনে সাবার ইহুদী চক্রান্ত আংশিক সাফল্য লাভ করলেও ইবনে সাবা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ভয়ঙ্কর জ্ঞানের অধিকারী এই পণ্ডিত ভাল করেই জানতো যে, তার ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলিম জাতির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে একদিন না একদিন তারা এর প্রতিশোধ নিবেই। তার ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উৎঘাটিত হলে মুসলমানরা সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে তখনই আবার ঐক্যবদ্ধ হবে। সুতরাং সে মুসলিম উম্মাহকে অনৈক্য, বিভ্রান্তি ও বিভেদের মধ্যে নিমজ্জিত রাখার জন্য এক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেয়। একদল দক্ষ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রচারক মুসলিম বিশ্বের আনাচে কানাচে পাঠিয়ে দেয়। এসব প্রচারক দল কুরআন–হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে বিকৃত করে নওমুসলিমদের নিকট উপস্থাপন করতে থাকে। নও মুসলমানরা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে সহজেই এসব প্রতারকদের প্রতারণার শিকার হল। ফলে যেসব প্রচারক যে স্থানে ইসলামকে যেভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে সেখানে সেই আকীদা–বিশ্বাস নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন সম্প্রদায়। এভাবেই সৃষ্টি হয় শিয়া, খারেজী, ইসমাঈলী, বাহাঈ প্রভৃতি দল–উপদল–সম্প্রদায়ের। এদের মন–মজ্জায় এমন উগ্র চিন্তা চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটান হল যে, এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের লোকজন নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান মনে করতে লাগল এবং অন্যান্যদের মোনাফেক, কাফের এবং তাদের ছল–চাতুরী, চক্রান্ত বা যে প্রকারেই হোক হত্যা করা পূণ্যের কাজ বলে মনে করতে লাগল।

এই ধ্যান–ধারণায় বিশ্বাসী ও সাবাপন্থী হিসেবে পরিচিতদের হাতে ইসলামের তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা শাহাদাত বরণ করেছেন, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া যুগের পর যুগ মুসলিম বিশ্বে গৃহযুদ্ধ, ভ্রাতৃঘাতী লড়াই, শাসক উৎখাতে প্রসাদ ষড়যন্ত্র, বহিঃশক্তির মুসলিম বিশ্বে হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করার জন্য বিভীষণ তৈরি এই সাবাপন্থীরাই সাধন করেছে।

১২৫৮ সালে মধ্য যুগের ত্রাস বর্বর মোঙ্গলদের হাতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব ও ৬০০ বছরের মুসলিম ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ সহ মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ বিশ্বখ্যাত জ্ঞান–বিজ্ঞানের ক্ষেত্রভূমি সমরকন্দ, বুখারা, খোরাসান, খাওয়ারিজম, রয়, আজারবাইজান, হামদান, দরবন্দ, শিরওয়ান, কসবীন, তাবরীজ, মরাগান, মবাগ, আরবল, তিবরিজ, বলখ, নিশাপুর, হিরাত, কুম, মশুল প্রভৃতি ধ্বংস স্তুপে পরিণত হওয়া ও লক্ষ লক্ষ্য নারী–পুরুষ ও শিশু হত্যার শিকার হওয়ার পেছনেও সক্রিয় ছিল সাবাপন্থীদের চক্রান্ত। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ এর মন্ত্রী সাবাপন্থী শিয়া ইবনুল আলকামীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে কুখ্যাত হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে শহরটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খান বা হালাকু খান বর্বরতা ও ধ্বংস তাণ্ডব চালিয়ে পুরো এশিয়াকে বিধ্বস্থ ও পদানত করলেও মুসলমানদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে মুসলিম সম্রাজ্যে আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত ছিলো। কিন্তু খলিফার শিয়ামন্ত্রীর বিশ্বাসঘতামলূক আমন্ত্রণ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘতকতার ফলে খলিফা নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। বাগদাদ নগরীতে ৪০দিন পর্যন্ত চালানো হয় হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংস তাণ্ডব।

পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের কর্তৃক পরিচালিত ক্রুসেড কালীন সময়ে ক্রুসেডার বাহিনীকে প্যালেস্টাইন প্রবেশ করার পথ প্রদর্শক ছিলো প্যালেস্টাইনী ইহুদীরা। একই সময়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী

অঞ্চল মিশরে সাবাপন্থীদের চক্রান্তের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় সুন্নী মুসলিম বিরোধী উগ্রপন্থী ফাতেমীয় শিয়াদের শাসন। ক্রুসেডার বাহিনী যখন একেরপর এক মুসলিম শহর জয় করে ও লুণ্ঠন, ধ্বংস ও গণহত্যা চালিয়ে জেরুজালেমের উপকণ্ঠে হাজির হয় তখন তাদের প্রতিরোধে মুসলিম শক্তির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত মিশরের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের এই মহা দুর্যোগের সময় সাবাপন্থী শিয়াদের কারণে মিশরের কোন সহায়তা পাওয়া যায়নি। জেরুজালেমের পতনের দৃশ্য মিশরের শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত নিরুত্তাপ চিত্তে উপভোগ করে।

এভাবে ইবনে সাবা মুসলিম উম্মাহর বুকে সূক্ষ্মভাবে যে ধ্বংস ও বিভেদের বীজ রোপন করেছিল তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে আজ প্রকাণ্ড মাহিরুহে পরিণত হয়েছে। এর পরও ইহুদী চক্রান্ত থেমে নেই। মুসলিম উম্মাহ যাতে কখোনো এই বিভেদ, হানাহানি থেকে ফুরসত না পায় সে জন্য নিত্য নতুন ইহুদী চক্রান্ত উদ্ভাবিত হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ যাতে কখনো আর ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সেজন্য গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ইহুদী সংগঠন ফ্রি ম্যাসন, ওয়ান্ড জিওনিষ্ট অর্গানাইজেশন। মুসলিম যুবশক্তিকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুসলিম দেশ সমূহে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে লায়ন, লিও প্রভৃতি সেবার ছদ্মবেশধারী ইহুদী ক্লাব, এনজিও, ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী। মুসলিম যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রেস আর প্রচারণার হাতিয়ারকে ব্যবহার করছে অত্যন্ত সুকৌশলে। কোন দেশে কোন লক্ষ্যে বিপ্লব ঘটানোর পূর্বশর্ত হলো মানুষের মস্তিষ্কে বিপ্লব ঘটানো। আর এই বিপ্লব ঘটানোর প্রধান হাতিয়ার হল সাহিত্য। এজন্য আধুনিক যুগে বিশ্ব মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইহুদী কবি, লেখকরা চরিত্র ধ্বংসকারী সাহিত্য রচনায় অধিক মনোযোগী হয়েছে। বিশ্বের অত্যাধুনিক ইলেকট্রোনিক প্রচার মিডিয়া স্থাপন করে অনর্গল মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব ও প্রভূত্ব স্থাপন করা ইহুদীবাদের মূল কথা। আর এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপর্যয় সাধনই ইহুদীদের মূল তৎপরতা। এজন্য ইউরোপে যখন পাদ্রী ও প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রভাবিত শাসন ও ধর্মের প্রভাবহীন শাসন ব্যবস্থা নিয়ে প্রচণ্ড রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছিল তখন জেকব, হলিয়ক, ব্রেডলাক, সাউথ ওয়েল, থমাস প্রমুখ ইহুদী দার্শনিকেরা নাস্তিক্যবাদী সেকুলারিজমের মতবাদ পেশ করেন। পাদ্রীদের শোষণে অতিষ্ট জনগণ এ মতবাদ মূহূর্তের মধ্যে লুফে নেয়। পরবর্তীতে ইহুদী প্রচার মাধ্যমের প্রচারণার বদৌলতে সেকুলারিজম, ভূখণ্ড ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র হয়ে দাড়ায় বিশ্বের মহান (!) শাসন ব্যবস্থা। মুসলিম বিশ্বের নৈতিকভাবে বিভ্রান্ত মুসলমানদের নাকের ডগায় ইহুদীরা এই মহান শাসন ব্যবস্থার মূলো ঝুলিয়ে ধরে তাদের প্রলূব্ধ করে। ইহুদী ও এই ভ্রষ্ট মুসলমানদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডার সয়লাবে মুসলিম বিশ্বে আজ সেকুলারিজম ও গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি হচ্ছে। এককালের মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র তুরুস্ক থেকেই এই তথাকথিত নব-জাগরণের উদ্বোধন করা হয়।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের স্মার্নার অধিবাসী শারতে শিবী নামক এক ইহুদী নিজেকে "মসিহ মউদ" দাবী করলে বহু ইহুদী তার ভক্তে পরিণত হয়। এই প্রতারক সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস পরিভ্রমণ করে ইস্তাম্বুল পৌছলে তুর্কী সুলতান মুহাম্মাদ তাকে গ্রেফতার করেন। পরে এই শিবী ভক্তদল সহ মুসলিম ঐক্যের প্রতীক তুর্কী খেলাফতকে ধ্বংস করার কুমতলবে মুসলমান বনে গিয়ে তুর্কী মুসলমানদের সাথে মিশে যায়। এই কুচক্রীরা মুসলমানদের আশ্রয়ে থেকে খিলাফত ধ্বংস করার জন্য "ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা" নামে একটি সংগঠন কায়েম করে বহু তুর্কী যুবককে বিভ্রান্ত করে। এদের তুর্কী সালতানাত উৎখাতের লক্ষ্যে প্ররোচিত করা হয়। ইতিহাসে এই কুচক্রিরা 'দু'নমা' মুসলমান হিসেবে পরিচিত। কালক্রমে এই সংগঠন জোরদার হতে থাকে এবং 'দুনমা' চক্রান্তকারীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পরাজিত তুর্কী শক্তির যখন নিবু নিবু অবস্থা ঠিক তখনই এই 'দুনমা'দের পরিচালিত 'ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা' মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সর্ব শক্তি নিয়ে হাজার বছরের ইসলামের ঐক্যের প্রতীক তুর্কী খেলাফতকে বিলুপ্ত করার জন্য বিষাক্ত ছোবল হানে। উল্লেখ্য তুর্কী খেলাফতকে ধ্বংস করার চক্রান্তে যারা প্রথম সারীতে ছিলো তাদের মধ্যে ডঃ নাজেম, ফওজী পাশা, তালাত পাশা, সগুম আকেন্দী, মাদহাত পাশা প্রমুখ সকলেই ছিল এই 'দু'নমা' সম্প্রদায়ের লোক। কামাল পাশাকে খেলাফত কাঠামো বাতিল করে পাশ্চাত্যের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আমদানীতে এরাই ইন্ধন যুগিয়েছিল।

ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের শত্রুতা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে প্রতিভাবান ও ইসলাম দরদী মুসলিম নেতাদের হত্যা উদিয়মান মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করা ও ইসলামী আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য এরা পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে মধ্য প্রাচ্যে কায়েম করেছে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল ও এর গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হাজারো সমস্যা সৃষ্টি ও তা' জিইয়ে রেখে আরব মুসলমানদের উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে এই রাষ্ট্রটি চারবার আররদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে বিস্তৃর্ণ আরব ভূমি দখল করেছে।

(২৩পৃঃ দেখুন)

চির মুসলিম দুশমন ইবনে সাবার উত্তরসূরী
ইসমাইলিয়া আগাখানীদের মুখোশ উন্মোচন

মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

গত ৫ই মে ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের কথিত ইমাম প্রিন্স করীম আগাখান ৪ দিনের এক শুভেচ্ছা সফরে ঢাকা এসেছিলেন। ঢাকা এসে পৌঁছলে সরকারীভাবে তাকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন কে এই আগাখান? কি তাঁর পরিচয়? মুসলমানদের সাথে আগাখানীদের সম্পর্ক কি? ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায় কি মুসলমান? বাংলাদেশ সরকার তাকে দাওয়াত করে এনে এত মর্যাদাই বা দিলেন কোন সূত্রে? এ প্রশ্ন গুলোর যথাযথ নিরপেক্ষ উত্তরদানের জন্যই বক্ষমান নিবন্ধের অবতারণা।

আমরা প্রথমেই আগাখান তথা তার অনুসারী ঈসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং তাদের তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। নবম শতাব্দীর শেষ দিকে দক্ষিণ পারস্যের (বর্তমান ইরান) আবদুল্লাহ্ বিন মায়মুন নামে জনৈক ব্যক্তি ইসমাঈলীয়া মতবাদ উদ্ভাবন করেন। তিনি নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার করতেন না। তার মতে ইসমাঈল ছিলেন সর্বশেষ নবী ও ঈমাম। আব্দুল্লাহ্ নিজেকে ইসমাঈলের সহকারী মনে করতেন এবং এই মতবাদ প্রচারের জন্য শিয়াদের "তাকিয়া" অর্থাৎ কপট নীতির ন্যায় গুপ্ততার নীতিউদ্ভাবনকরেন।

এই ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায় ইসনা আসারিয়া অর্থাৎ শিয়াদের দ্বাদশ ঈমামের স্থলে সাতজন ঈমামে বিশ্বাসী। তারা মুসা-আল-কাজিমকে সপ্তম ঈমাম বলে স্বীকার করে না। শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী জাফর-আস-সাদেক চারিত্রিক দোষের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলকে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেননি। উপরন্তু তার মৃত্যুর পূর্বেই ইসমাঈলের মৃত্যু হওয়ায় দ্বিতীয় পুত্র মুসা-আল-কাজিম সপ্তম ঈমাম নিযুক্ত হয়। কিন্তু ইসমাঈলী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, যেহেতু ঈমাম মাছুম এবং সকল ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে সেহেতু ইসমাঈল মদ্যপায়ী হলেও তাকে দোষারোপ করা যায় না। এভাবে সপ্তম ইমামে বিশ্বাসীদের কর্তৃক ইসমাঈল ঈমাম হিসেবে স্বীকৃতি পেলে এই সম্প্রদায়কে ইসমাঈলীয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সম্প্রদায়ের নিকট সাত সংখ্যাটি খুবই পবিত্র। যেমন সাতজন ইমাম। তাদের বিশ্বাস মতে দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনে কেবল সাতজন নবী আগমন করেছেন। যথাঃ আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ), মুহাম্মদ (সঃ) ও ইসমাঈল। তাদের অন্তবর্তীকালে সাতজন নীরব (গুপ্তভাবে) ধর্মীয় ইমাম ছিলেন। এদের মধ্যে ইসমাঈল, আলী (রাঃ), আরন, পিটার অন্যতম। তাদের অন্যতম বিশ্বাস হল সপ্তম ঈমাম ইসমাঈল 'ইমাম মাহদী' রূপে ত্রাণ কর্তা হিসেবে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন।

এ মতবাদের উদ্ভাবক আব্দুল্লাহ্ ইবনে মায়মুন শুরু থেকেই আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস এবং সুন্নী মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী গুপ্ত তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন। তার মতবাদকে গোপনে প্রচার করার জন্য একদল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গুপ্ত প্রচারককে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। বসরা এবং সালা-মিয়া ছিল তার মতবাদ প্রচারের অন্যতম ঘাটি। তার প্রচেষ্টায় কাঠার এবং কাতামা গোত্র এ মতবাদ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য শিষ্য ইয়ামানের সানার অধিবাসী আবু আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইন এ মতবাদের প্রচারাণা আরও ব্যাপক জোরদার করেন এবং উত্তর আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী দূর্গ নির্মাণ করেন। তারই প্রচেষ্টায় তিউনিশিয়ায় প্রথম ফাতেমী শিয়া খিলাফত স্থাপিত হয় (৯০৯ খৃঃ)। পরবর্তিতে এই ফাতেমীয় শিয়া বংশধর আল-মুই'জের সময় ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মিশরেও ফাতেমীয় শিয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মায়মুন কর্তৃক প্রচারিত ইসমাঈলী মতবাদের অন্যতম অন্ধ্য ভক্ত পারস্যের আল-হাসান-আল সাব্বাহ কর্তৃক ১০৯০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম উপদল গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়। সেলজুক সুলতান মালিক শাহের সময় এই সম্প্রদায় গুপ্ত হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে ইসলামের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। গুপ্তঘাতক দলের প্রতিষ্ঠাতা হাসান-আল সাব্বাহ ইরানের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আলামূত পর্বত শিখরে একটি সুরক্ষিত দূর্গ দখল করে শক্তি সঞ্চয় করে এই তৎপরতা চালাত। পরবর্তিতে সাব্বাহ এই দূর্গকে কেন্দ্র করে আশে পাশে আরও বহু দূর্গ দখল করে নেয়। এই হাসান-আল-সাব্বাহ বিশ্বখ্যাত সেলজুক উজির নিজাম-উল-মূল্কের সহপাঠী ছিল। জ্ঞান তাপস নিমাজ-উল-মূলক ১০৬৫-৬৭ সালে বাগদাদে মিশরের ফাতেমীয়দের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-আজহারের প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় নিজামিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। (তবে যে উদ্দেশ্যে তারা আল-আজহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কায়িম করেছিলো সে উদ্দেশ্য ব্যার্থ হয়। কেননা পরবর্তীতে এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামাতের আকীদায় বিশ্বাসীদের দখলে চলে যায়।) নিজাম নিজে ছিলেন সুন্নী মতবালম্বী এবং তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিয়া মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হতো। ১০৯১ খৃষ্টাব্দে নিজামের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সুন্নী প্রচারণায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উগ্রপন্থী আল-হাসান-সাব্বাহর নির্দেশে একজন ইসমাঈলী গুপ্তঘাতক তাকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আতঙ্ক ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রিয় উজীর এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে সুলতান মালিক শাহও সে বছরই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মারা যান। এ ঘটনা সেলজুক বংশের স্থায়িত্বে মারাত্মক আঘাত হানে। মালিক শাহ মৃত্যুর পূর্বে গুপ্তঘাতকদের আড্ডাস্থল আলমূত দূর্গ দখলের জন্য অভিযান প্রেরণ করলেও তা' সফল হয়নি। কিন্তু ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল সেনাপতি হালাকু খান এই দূর্গসহ গুপ্তঘাতকদের সকল দূর্গ ধ্বংস করে দিলে গুপ্তঘাতকদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পরে। গুপ্তঘাতকদের নেতা হাসান-আল-সাব্বাহ এর পরবর্তি বংশধরেরা প্রচার করতে থাকে যে, "আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না, সুতরাং বিশেষ কোন ধর্মে (ইসলামে) বিশ্বাস করা উচিত নয়।" (নাউযুবিল্লাহ) এজন্য সুন্নী মুসলিম জগতে এরা 'মোলহিদ' বা অপচিত্র বিধর্মী হিসেবে পরিচিত।

মোঙ্গলদের কর্তৃক ভাগ্য বিপর্যয়ের পর এ সম্প্রদায় দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এরা ইংরেজদের গোয়েন্দা পুলিশের এজেন্ট রূপে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানোর জন্য ইরানে প্রবেশ করে। কিছু দিন পর সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এরা ইরান থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়। আফগানিস্তানেও এরা ইংরেজদের সহযোগিতায় একটি ইসমাঈলী রাষ্ট্র কায়েমের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে। এই গুপ্তঘাতক ইসমাঈলীদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই ভারত বর্ষের আজাদীর অন্যতম সিপাহসালার মাওঃ ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি (রঃ) শহীদ হন। ইংরেজদের একনিষ্ঠ দালালীর পুরস্কার স্বরূপ এই সম্প্রদায় ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আফগানিস্তান থেকে উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং করাচী, বোম্বাই প্রভৃতি বাণিজ্যিক শহর গুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। পরবর্তিতে এরা একটা ধনকুবের সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সেই গুপ্তঘাতক ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী হলেন আজকের আলোচ্য ধনকুবের 'প্রিন্স করীম আগাখান'।

এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তির শুরু থেকে সুন্নী মুসলমান এবং তাদের মতবাদের বিরোধীতাকারী সকল সম্প্রদায়কে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে দমন করার নীতি গ্রহণ এবং তা' বৈধ ও ধর্মীয় পবিত্র কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে। এ জন্য এরা সর্বদা মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধী এবং তাদের ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। আজো পাকিস্তানে বসবাসরত এই ইসমাঈলীয়া শিয়ারা তাদের গুপ্ত ঘাতক চরিত্র কড়ে ধরে আছে। বাংলাদেশেও এদের পদচারণা সবর হয়ে উছঠে পাকিস্তানে অহরহ সংঘঠিত শিয়া-সুন্নী দাঙ্গার হোতা এই সম্প্রদায়। এরা প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বদের হত্যা থেকে শুরু করে মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করে মুসল্লীদের হত্যা, বাসে, ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যাত্রীদের নির্বিচারে হত্যা করে জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত করে যাচ্ছে। পাকিস্তানের অন্যতম ধর্মীয় সংগঠন "সিপাহি সাহাবার" সভাপতি প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ হক নেওয়াজ জঙ্গী রহঃ তাদের এই গর্হিত তৎপরতার সমালোচনা করতেন বলে ইসমাঈলী গুপ্তঘাতকেরা এক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে তাকে শহীদ করে দেয়। সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করলে আগাখানের অনুসারী ইসমাঈলী শিয়ারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এবং আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ভূমিকা নেয়। আফগানিস্তানের দাখান অঞ্চলে এই ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তারা সোভিয়েত বাহিনীকে এ এলাকায় প্রবেশ এবং ঘাটি স্থাপন করার সুযোগ করে দেয়। এই দাখান অঞ্চল আফগানিস্তানের একমাত্র এলাকা যা রুশ বাহিনী বিনা বাধায় দখল করে নেয় এবং স্থানীয়দের সাহায্য লাভ করে। ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল বিজেপির সদস্যরা অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেললে এই ইসমাঈলী সম্প্রদায় হিন্দুদের সমর্থন করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার-যন্ত্রের মাধ্যমে বিষোদ্গারণ করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতিসত্বা রক্ষার মহান উদ্দেশ্যে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তন সৃষ্টি হলে আগাখান হিন্দুদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি ও জিন্নাহর দাবীর বিরোধিতা করে। মোটকথা এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতা এবং ক্ষতি সাধন করেই আসছে।

এবারে আমরা ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের যুগ ইমাম বলে কথিত প্রিন্স করিম আগা খানের ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করব। পাকিস্তানের করাচী থেকে ইসমা-ঈলীয়া এসোসিয়েশন থেকে প্রকাশিত এয়ার ল্যাংগ গাইডে আগা খান মন্তব্য করেছেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশের সাথে আমার সম্পর্ক। দু'কোটিরও বেশী মুসলমান আমার অনুসারী। তারা আমাকে আধ্যাত্মিক নেতা বলে বিশ্বাস করে, আমাকে খাজনা দেয় ও আমার ইবাদত করে। একারণে যে, আমার ধমনীতে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর রক্ত প্রবাহমান।"

অর্থাৎ তিনি মনে করেন ধর্ম একটা জমিদারী তালূক। তার কাছে ধর্ম আমাদের দেশের ভণ্ড পীরদের ন্যায় একটা ব্যবসার

মুলধন বিশেষ। কিছু লোকের মনে নিজেকে ধর্মের মহান পুরুষ এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের পায়ের ওপর হরমুর করে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর বিনিময়ে ট্যাক্স আদায় করতে হবে। ব্যাস, তাহলেই আর কোন সম্পর্কের প্রয়োজন নেই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সত্যিকার বংশধর বনে যাওয়া যাবে।

এই গাইডের অন্য এক স্থানে আগাখান অন্যান্য মতাবলম্বীদের কটাক্ষ করে বলেছেন, "হিন্দু মুসলমান সকলেই ক্রন্দন করবে। ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষী, পুরান পাঠ করলেও ক্রন্দন করবে, মোল্লা-কাজী কুরআন পড়েও ক্রন্দন করবে। কারণ, এরা সত্য বাদশাহ তথা ঈমামের হেফাজত লাভ করতে পারেনি। এসব পথভ্রষ্ট লোক পীর তথা ঈমামের পরিচয় না পাওয়ার কারণে ক্রন্দন করবে। শুধু সেই ব্যক্তি যে ইমাম ও আলীর সন্ধান পেয়েছে সে ক্রন্ধন করবে না।" ভারতের বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইসমাঈলীয়া এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসমাঈলীয়া কিতাব 'ফালামে ইমামে মুবিনে" আগা খানের অনুসারীদের ধর্মমত সম্পর্কে বলা হয়েছে, "হযরত মাওলা মুরতজা আলীর মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর থাকার কারণে এবং হযরত আলীর মোবারক নাম উচ্চারণ করলে আল্লাহ্‌র নূর অনুভূত হওয়ার কারণে আমরা কালেমার মধ্যে হযরত আলীর নাম ব্যবহার করি। আলী আল্লাহ। তথা আল্লাহ্‌র মধ্যে আলী আছেন বা আলীর মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর বিদ্যমান------।"

"মুরশিদ তথা যুগ ইমাম সব কিছুই জানেন। তিনি যদি ঈমামের মূর্তির পরিবর্তে মদকে সেজদা করতে বলেন, তাহলে তাই করতে হবে। কারণ মুরশিদের আদেশ অলংঘনীয়।"

"মুরতজা আলী মহান ব্যক্তি। তার নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। তিনি স্বীয় শক্তি বলে পাপ মোচন করিয়ে মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারেন------।"

"খলীফা ওসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে কুরআনের কিছু অংশ রেখে বাকী অংশ বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল------।"

"যুগ ঈমামের নিকট সব সময়ই একটি নতুন জিনিস থাকে যা তৎক্ষণাৎ বলা যায় না। তিনি পরে তা আমাদের বলে দেবেন------।"

"মহিলাদের জন্য বোরকা পরিধান করা মোটেই ভালো নয়। অন্তরের চোখে লজ্জার পর্দা থাকাই যথেষ্ট। এতে তোমাদের অন্তরে কখনো কুচিন্তা আসবে না------।"

"মানুষ কারবালায় গিয়ে কেন অনর্থক সময় নষ্ট করে? ইমাম হোসাইন তো এখন জামাত খানায়-ই থাকেন। কাজেই তোমরা এখানেই (জামাত খানায়) এসো---------।"

"তোমরা এ যাবত যত গুনাহ করেছো আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। তবে ভবিষ্যতে আর গুনাহ করবে না------।"

আমাদের আধ্যাত্মিক সন্তানদের সর্ব প্রথম ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব হলো পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা করা। বৃটিশ সরকার আপনার ধর্ম ও স্বাধীনতা সব কিছুরই রক্ষা করবেন। তাই পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সর্বশক্তি ব্যয় করে তাদের সেবা করে যাওয়া উচিত---------।"

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত অন্য আর এক কিতাব 'কালামে এলাহী' তথা ফারাসীনে ইমামে মুবেনে বলা হয়েছে "স্মরণ রাখতে হবে যে, যুগ ঈমামের আনুগত্য মূলতঃ আল্লাহ্‌রই আনুগত্য। ঈমামের নির্দেশ মান্য করা আল্লাহ্‌কে মান্য করার-ই নামান্তর------।"

আমরা ঈমামী ইসমাঈলী সম্প্রদায়। যুগ ঈমামের মুরীদ। আল্লাহ্‌র নূর যা যুগ ঈমামের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা তাকে সেজদা করি------।"

"ইয়া আলী মদদ" আমাদের সালাম। "মাওলা আলী মদদ" আমাদের সালামের জবাব। উঠতে বসতে "ইয়া আলী মদদ" বলে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ইয়া আলী মদদ বল। ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গণে যাওয়ার সময় "ইয়া আলী মদদ" বল। ঘরে প্রবেশ করার সময় "ইয়া আলী মদদ" বল। মা-বাপকে "ইয়া আলী মদদ" বলে সালাম কর। ভাই বোনকে "ইয়া আলী মদদ" বলে সালাম কর।"

কুরআনের সঠিক জ্ঞান এবং এর লুকায়িত রহস্যাবলীর প্রকৃত অর্থ যুগ ঈমামের-ই-জানা আছে। যুগ ঈমাম হলেন জীবন্ত কুরআন। তার নির্দেশাবলী মেনে চলা উচিত। এতে দুনিয়ার আলো নিহিত------।"

"ঈমামের হাত খোদার হাতের সমান, ঈমামের চেহারা খোদার চেহারার সমান। পূর্ণ আস্থার সাথে ঈমামের সাথে সাক্ষাৎ করা স্বয়ং খোদার সাথে সাক্ষাতের নামান্তর------।"

"কুরআন সর্বমোট চল্লিশ পারা। তার মধ্যে ত্রিশ পারা দুনিয়ার মানুষের নিকট আর অবশিষ্ট্য দশ পারা আছে ঈমামের ঘরে। এই দশ পারাকে 'ফতহারদীদ' বলা হয়। এই দশপারা কুরআনই ঈমামের ভাষা।"

যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে আলীর অনুসরণ করবে; তার সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি পাবে এবং সে সফলতা অর্জণ করতে পারবে। তাই তোমরা আলীর আনুগত্য ও ইবাদত করতে থাক। বস্তুত আমাদের এই আলী-ই হলেন প্রকৃত স্রষ্টা------।" নাউযুবিল্লাহ

এছাড়া এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, অজু করার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের অন্তর সর্বদাই অজুময় থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে জামাত খানায় (মসজিদের পরিবর্তে ব্যবহারিত) গিয়ে তিন সময় দোয়া করা প্রতিটি আগা খানীর উপর ফরজ। রোযা ফরজ নয়। খানা পিনা বন্ধ করলেই রোযা হয় না। রোযার সম্পর্ক চোখ কান ও যবানের সাথে। যাকাতের পরিবর্তে তারা টাকা প্রতি দু'আনা জামাত খানায় দেয়া ফরজ মনে করে। ইত্যাদি।

আগা খানীরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করলেও তাদের মতাদর্শ থেকে স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয় যে, তারা ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা, যাকাত, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, অজুকে স্বীকার করে না অর্থাৎ তারা ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ রুকন সমূহের অস্বীকারকারী। ইসলামী বিধান

অনুযায়ী ফরজ অস্বীকারকারী কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায় তাদের যুগ ইমামকে (বর্তমান করীম আগা খান) সিজদা করাকে অবৈধ বলে মনে করে না। অথচ ইসলাম একে শিরক এবং মহা পাপের কাজ বলে ঘোষণা করেছে। আলী (রাঃ) ইসলামের চতুর্থ খলিফা এবং রাসূল (সাঃ)–এর একজন সম্মানিত সাহাবী মাত্র। কিন্তু এই সম্প্রদায় তাঁকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাথে তুলনা করেছে। এদের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি মানুষের পাপ মোচন করে দিতে পারেন, সন্তান ও ধন–সম্পদ দিতে পারেন। অথচ এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই বলে স্বয়ং আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন। এরা কুরআন শরীফের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাকে অথচ কুরআনের বিশুদ্ধতা সর্বজনস্বীকৃত এবং প্রমাণিত। যুগ ঈমামকেও আল্লাহ্‌র সাথে তুলনা করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এটি পৃথিবীর এমন একটি ধর্মমত যার রক্ষক হিসেবে অন্য ধর্মাবলম্বী খৃষ্টান ভূমি ইংল্যাণ্ডকে মনোনীত করা হয়েছে এবং এর বিনিময়ে প্রতিটি ইসমাঈলীয়াকে বৃটিশ সরকারের সহযোগিতার নামে গোলামী করাকে ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে।

আগা খানীদের এমন উদ্ভট, ইসলাম বিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর মতাদর্শের কারণে বিশ্বের সকল বরেণ্য আলিম এদের অমুসলিম কাফের বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, এদেশের কোটি কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার সম্প্রতি এই অমুসলিম সম্প্রদায়ের কথিত ইমাম আগা খানকে বিপুল সম্বর্ধনা ও সম্মান জানিয়ে তাকে একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইমাম বলে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। আমরা জানি না সরকার কোন্ দলিল সূত্রে সারা বিশ্বে অমুসলিম হিসেবে ঘোষিত এই সম্প্রদায়ের নেতাকে মুসলমান বলে ফতোয়া দিলেন। তবে যতদূর সম্ভব আমরা জানি সরকার এই ধনকুবেরকে এদেশে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার জন্য এত বিপুল সম্মান দেখিয়েছেন, মুসলমান বলে আমাদের কাছে পরিচিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আমরা কি এত কাঙ্গাল হয়ে পড়েছি যে বেঁচে থাকার জন্য আজীবন ইসলামের দুশমনদের অর্থ সাহায্যের জন্য ইসলামকে অপব্যবহার করতে হবে? ধর্মের চেয়ে ঈমানের চেয়ে টাকার মর্যাদা কি বেশী? সাপের মাথায় মনি আছে বলে তা প্রাপ্তির জন্য কি সাপের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো বুদ্ধিমানের কাজ? আগা খানকে এবারই প্রথম নয়, এর পূর্বেই চারবার এদেশ সফরের সময় তাকে মুসলমান বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, ভবিষ্যতে বৈষয়িক প্রাপ্তির বিনিময়ে কেউ যদি একটা গাধাকেও স্যুট–টাই পরিয়ে, মুসলমানের রং লাগিয়ে তাকে ধর্মীয় ঈমাম বলে চালিয়ে দেয় তাহলে এদেশ থেকে মুসলিম বলে সার্টিফিকেট পেতে সেটির কোন বেগ পেতে হবে না।

হাঁপানি বাত প্যারালাইসিস চর্মরোগ এ্যালার্জি

- গ্যাস্টিক, আলচার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
- প্রস্রাবে ক্ষয়, ঘনঘন প্রস্রাব, (ডায়াবেটিস), প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা
- স্বপ্ন দোষ, শ্রক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গে দোষ।
- সিফিলিস, গনোরিয়া, প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া রক্ত পুঁজ যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রী ব্যাধি

- শ্বেত পদর (লিকুরিয়া), রক্ত প্রদ, বাধক বেদনা, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ, সুতিকা, শুকনা সুতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ।
- অর্শ, গেজ, ভগন্দর, শ্বেতী, সুলী, ব্রন, মেস্তা, কানপাঁকা, কানে কম শোনা, চক্ষুরোগ, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মৃগী, পাগল, অকাল চুল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে নিশ্চয়তা।

উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রান্ত তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিনের সহিত নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ

হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিন

গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন–১২, ব্লক ডি (পানির ট্যাংকি সংলগ্ন)

মিরপুর, ঢাকা–১২১২২

মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়?

ইবনে বতুতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলামী ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের সাথে বিজড়িত এক ভূখণ্ডের নাম ফিলিস্তিন। বহু নবী (আঃ) এর পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত এই ফিলিস্তিন। এই ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছেন ঈসা (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), জাকারিয়া (আঃ) প্রমুখ সহ সহস্রাধিক সম্মানীত নবী। এই ভূখণ্ড ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ)–এর তাওহিদের বাণী প্রচার ক্ষেত্র। মুসলমানদের প্রথম কেবলা, অন্যতম পবিত্রস্থান ও রাসূল (সাঃ)–এর মিরাজের পবিত্র স্মৃতিবাহী আল–আকসা মসজিদ এই ভূ–খণ্ডেই অবস্থিত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) –এর স্মৃতিবাহী উমর মসজিদও এই ভূ–খণ্ডে দাড়িয়ে আছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর খেলাফতের শেষ বর্ষে আবু ওবায়দা (রাঃ) ও খালেদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ইয়ারমুক প্রান্তরে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করলে ফিলিস্তিন মুসলমানদের দখলে আসে। সেই থেকে কয়েক বছর ব্যতিত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরী একই সাথে মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র ভূমি হওয়ায় এই নগরীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে। এ ফিলিস্তিনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক প্রলয়ঙ্কারী ধ্বংসের তাণ্ডব। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আক্রমণে এ ভূখণ্ড বারংবার রক্ত রঞ্জিত হয়েছে, অশান্তির ঢেউ বয়ে গেছে তার উপর থেকে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, মক্কা–মদীনার পর মুসলমানদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং ঐতিহাসিক ভূ–খণ্ড ফিলিস্তিন আজ আর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রনে নেই। আল–আকসা মসজিদ আজ বেদখল, ফিলিস্তিন নামক ভূ–খণ্ডটির নাম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এই ভূ–খণ্ডটি জবর দখল করে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম বিশ্বের এক অশুভ মুহূর্তে এর বুকের উপর চাপিয়ে দেয় এক জগদ্দল পাথর অবৈধ রাষ্ট্র "ঈসরাইল"। সাম্রাজ্যবাদী ও জায়ানবাদীদের আগ্রাসন ফিলিস্তিনকে গ্রাস করেই থেমে থাকেনি, তাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে আরও বিস্তৃর্ণ আরব ভূ–খণ্ড, পবিত্র নগরী জেরুজালেম এবং আল–আকসা মসজিদ।

পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র এই ইসরাঈল। মুসা (আঃ)–এর প্রচারিত তাওহীদ ও আসমানী কিতাব তাওরাতকে বিকৃতিকারী এবং অভিশপ্ত ইহুদীরা এই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাস, সকল প্রকার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি–নীতিকে উপেক্ষা করে পেশী শক্তির বলে এবং সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এই রাষ্ট্রটির বুনিয়াদ গড়ে তোলা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সকল ঐতিহাসিকগণের মতে, খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহুদী উপজাতিগুলি ভাগ্য উন্নয়নের আশায় আরব উপদ্বীপ থেকে কেনানের পার্বত্য এলাকায় (বর্তমান সিনাই উপত্যকা) বসবাস করতে শুরু করে এবং কালক্রমে তাদের বংশধরেরা ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়াকুব (আঃ)–কে আধুনিক ইহুদী নামে পরিচিত ইসরাঈল জাতির জনক বলা হয়। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই অনুর্বর ও পার্বত্য ফিলিস্তিন ত্যাগ করে ৫০ লক্ষের মধ্যে ৪৩ লক্ষ ইহুদী ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চলে যায়। একই সময়ে রোমানরা ফিলিস্তিন দখল করে ইহুদীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। ফলে ফিলিস্তিনের বাকী ইহুদীরা দেশ ত্যাগ করে অনত্র চলে যায়। ষোল শতকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা দাড়ায় মাত্র পাঁচ হাজারে। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীরা পাশ্চাত্যের ঘারে পা রেখে ভাড়াটিয়া হিসেবে জড়ো হয়ে যে ইসরাঈল রাষ্ট্রটি কায়েম করে ফিলিস্তিনের ওপর নিজেদের অধিকার দাবী করেছে তা' ঐতিহাসিকভাবেই অযৌক্তিক। এসব ইহুদীরা এবং তাদের পূর্বপুরুষরাও সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা নয়। দূরদেশের বাসিন্দা এসব ইহুদীরা তাদের দাবীকে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যুক্তিসংগত প্রমাণের উদ্দেশ্যে যে ধর্মীয় কল্পকাহিনী প্রচার করে থাকে তা কোন ভাবেই ধোপে টেকাতে পারছে না।

ইহুদীরা জুডাইক কল্পকাহিনী, জেরুজালেমের ঐতিহাসিক স্মৃতি জিওনের পবিত্র পাহাড়, বহু নবী (আঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত আল আকসা মসজিদ জেরুজালেমে অবস্থিত বলে ইহুদীরা জেরুজালেমকে রাজধানী করে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দাবী করলে দীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনের বাসিন্দা আরব মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং রাসূল (সাঃ)–এর পবিত্র স্মৃতিবাহী মসজিদ যে ভূ–খণ্ডে অবস্থিত সেখানে রাষ্ট্র গঠন দূরে থাক বসবাসেরও অধিকার পাবে না কেন?

ধর্মীয় রূপকথাকে অবলম্বন করে রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী স্বীকার করে নিলে দুনিয়ার সকল মুসলমান যদি একত্রিত হয়ে আরব নাগরিকদের বহিস্কার করে মক্কা মদীনাকে কেন্দ্র করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম

করে তবে তাদের সে দাবী কি যৌক্তিক হবে? বিশ্বের ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা ভ্যাটিক্যানকে কেন্দ্র করে ইটালিয়ানদের তাড়িয়ে যদি একটি ক্যাথলিক রাষ্ট্র গঠন করতে চায় তবে ইটালীর নাগরিকেরা কি সে দাবী মেনে নিবে?

অথচ আধুনিক সভ্যতার নির্মাণে দাবীদার কামার কুমারেরা এই সভ্য যুগেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই যুক্তিহীনতা এবং অপরের অধিকার ক্ষুণ্নকারী বর্বরদের প্রশ্রয় ও শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে। অপরাধীদের তাদের অপরাধ চালিয়ে যেতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। ইটালিয়ানদের দেশছাড়া করে যদি ভ্যাটিকান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের খৃষ্টান রাষ্ট্র কায়েম করার সুযোগ করে দেয় তবে ইটালিয়ানদের ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বাধা প্রধান করার অধিকার ন্যায় সঙ্গত এবং সভ্যতাগর্ভী বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃতও। অথচ এই সভ্য যুগের আইন কানুনই ফিলিস্তিনীদের বেলায় প্রয়োগ হচ্ছে বিপরীত ভাবে। ফিলিস্তিনী আরবরা দেশটির শতাব্দীর পর শতাব্দীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও এবং জায়ানবাদীদের আগ্রাসনকে প্রতিহত করার অধিকার ন্যায় সঙ্গত হলেও তা' সাদা দুনিয়ার সভ্য মানুষেরা মানতে চান না। তাদের দৃষ্টিতে ফিলিস্তিনীরা সন্ত্রাসবাদী, তারা মানবতার ঘৃণিত শত্রু।

ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহুদীদের কখনও কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত এ জাতি ছিল সর্বত্র লাঞ্ছনা ও ঘৃণার শিকার। চক্রান্ত, ধূর্তামী এবং গণ্ডগোল সৃষ্টি করে স্বার্থ উদ্ধার ইহুদীদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্টে পরিণত হওয়ায় ইউরোপের প্রতিটি দেশে এরা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এছাড়া যিশু খৃষ্টের [ঈসা (আঃ)] এর হত্যা প্রচেষ্টার সাথে ইহুদীরা জড়িত ছিল বলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যের ইহুদীরা খৃষ্টানদের কর্তৃক পথেঘাটে হত্যার শিকার হত। এ সময় পর্যন্ত ইহুদীরা ছিল খৃষ্ট জগতের অন্যতম শত্রু। এই সময়ে খৃষ্টান জগত মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বারংবার ক্রুসেড চালিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাশ্চাত্যের খৃষ্টজগত মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ে ক্রুসেড পরাজয়ের ষোল আনা প্রতিশোধ নিতে উদ্যোগী হয়। তারা মুসলিম শক্তিকে চিরদিন দমন করে রাখার উদ্দেশ্যে কাটা দিয়ে কাটা তোলার কুমতলব আটে। এই যুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স আরব বিশ্বে জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে তুর্কী উসমানীয়দের কর্তৃক ৪০০ বছর যাবৎ শাসিত ইরাক, সিরিয়া দখল করে। ফিলিস্তিন ও লেবানন তখন সিরিয়া প্রদেশের অংশ ছিল। ভাগাভাগির স্বার্থে ফ্রান্স ও বৃটেন ফিলিস্তিনকে সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বৃটেনের দখলে চলে যায়। যুদ্ধ চলাকালে ইহুদী ডাক্তার উইজম্যান বৃটেনকে উড়োজাহাজ তৈরির সূত্র দিয়ে সাহায্য করার বিনিময়ে ইহুদীদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের গোপন প্রতিশ্রুতি আদায় করে। জার্মানীর হিটলার বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের পাইকারী হত্যার নির্দেশ দিলে পলাতক ইহুদীরা মিত্র পক্ষের ছত্রছায়ায় নিজস্ব ইউনিট গঠন করে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এসব ইহুদী ইউনিট তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর সাথেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এ ছাড়া ধনী ইহুদী ব্যাঙ্কার গোষ্ঠি যুদ্ধের সময় মিত্র পক্ষকে দেয়া বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা মওকুফের বিনিময়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের শর্ত আরোপ করলে পাশ্চাত্য তাদের এককালের শত্রুদের মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর বসিয়ে ছড়ি ঘোরানোর জন্য ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করার পরিকল্পনা নেয়। এভাবেই ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যে এক অশুভ আতাতের ফলে সৃষ্টি হয় জারজ রাষ্ট্র ইসরাঈল। ১৯২২ সালে বৃটেন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী তৎকালীন জাতিসংঘ (লিগ অব ন্যাশনস)কে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনে ম্যানডেটরী শাসন কায়েম করে। এই সময়ে ফিলিস্তিনে আরব মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, অন্যদিকে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩ হাজার। লিগ অব ন্যাশনসের ম্যাণ্ডেটরী শাসনের হুকুমনামার অপব্যবহার করে বৃটেন ক্রমাগত ইহুদীদের আমদানী করে ফিলিস্তিনে জমা করতে থাকে এবং ১৯৪৭ সাল নাগাদ ইহুদীদের সংখ্যা দাড়ায় ১০ লক্ষে। ইহুদী ধনকুবের থচাইল্ড হার্শ ও অন্যান্যদের অর্থ ব্যবহার করে ইহুদীরা এ সময় অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় ও নিজস্ব সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর ব্যাপক জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ ও খেদাও অভিযান চালিয়ে ভূমি দখল করতে থাকে। ১৯৪৭-৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী নিহত হয়। অবশেষে লিগ অব নেশনস ঘোষিত বৃটেনের ম্যাণ্ডেটরী শাসনের অবসান ঘটলে বৃটেনের প্রত্যক্ষ মদদে ইহুদীরা ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।

জন্মলগ্ন থেকেই ইসরাঈল রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি মালা লংঘন, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শণ ও অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। প্রতিবেশী আরবদের ওপর চাপিয়ে দেয় বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রতিবারই পরাশক্তি রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র, সৈন্য ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে ইসরাঈলকে আরবদের রোষানল থেকে রক্ষা করে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে রাশিয়া, মিশরের সাথে বেঈমানী করে এবং আমেরিকার বিপুল পরিমান সৈন্য ইহুদীদের পক্ষে লড়াই করায় পর্যুদস্ত ইহুদীরা কোন মতে রক্ষা পায়। সেবারই তারা আল-আকসা মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়, মসজিদ অবমাননা করে এবং আরবদের ৬৭ হাজার বর্গ মাইল এলাকা দখল করে নেয়।

ইসরাইলী-ইহুদী আগ্রাসন এখনও অব্যাহত আছে। ইসরাঈলকে টিকে থাকার জন্য মদদ যোগাচ্ছে বৃটেন, ফ্রান্স এবং

বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র। পাশ্চাত্য তাদের এককালের শত্রুদের ব্যবহার করে ইসলামী আন্দোলনের সূতিকাগার মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ইসলামের পূণর্জাগরণ ঠেকাতে চাচ্ছে। তাদের প্রধান শত্রু মুসলমানদের দমন করাচ্ছে। আরব বিশ্বের হাজারো সমস্যার পেছনে রয়েছে ইসরাঈল। বলা যায় এই ইসরাঈলই হল মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমস্যা। পাশ্চাত্য তেলের সরবরাহ নিরাপদ রাখা এবং মুসলমানদের দমন করার জন্য একদিকে ইসরাঈলের সমরাস্ত্র ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে ইসরাঈলের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে আরবদের শান্তি স্থাপনের উপদেশ দিচ্ছে। ইসরাঈলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যে কোন মুসলিম দেশের সামরিক শক্তি যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা তৎপর। এইত সেদিন ইরাকের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেয়া হল, অতীতে মিশরকেও বেশ কয়েকবার হেস্ত নেস্ত করা হয়েছে একমাত্র এই কারণে। এছাড়া আরবরা কখনো ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে সেজন্য আরব উপদ্বীপকে টুকরো টুকরো করে কয়েক ডজন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং ভূ-সীমানা ও জাতীয়তা প্রভৃতি কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করে একটি দেশকে অন্য দেশের শত্রুতে পরিণত করে রাখা হয়েছে। ইরাক-কুয়েত, ইরাক-ইরান, কুর্দী, ইয়ামেন-সৌদী আরব, ইরান-আরব আমিরাত, সুদান-মিশর প্রভৃতি দেশের মধ্যে যে ভূ-খণ্ডগত বিরোধ ও যুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনেও রয়েছে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কালো হাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই সব শক্তি দীর্ঘ ৪০০ বছর যাবৎ রাজনীতির অভিজ্ঞতাহীন বিভিন্ন এলাকার আরবদের জাতীয়তাবাদ, সেকুলারিজম, কম্যুনিজম, গণতন্ত্রের বুলি শিখিয়ে বিভ্রান্ত করে এবং বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সরকার কায়েম হওয়ায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা রাজনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকে। ইরাক-সিরিয়া, ইরাক-মিশর, লিবিয়া-সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের পারস্পরিক বৈরিতা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও কোন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ইসলামের পক্ষে বা ইসরাঈলের বিপক্ষে কোন পদক্ষেপ নিলে তাকে গুপ্ত হত্যার শিকার হতে হয়েছে অথবা ক্ষমতালোভী সামরিক অফিসারদেরকে লেলিয়ে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে। অতএব একবাক্যে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদী চক্র মধ্য প্রাচ্যের তেল লুণ্ঠন করে নেয়া এবং ইসলামের পূর্ণজাগরণ ঠেকানোর জন্য ইসরাঈলের অংকুরিত হওয়া থেকে তার গোড়ায় পানি ঢেলে একটা প্রকাণ্ড মাহিরুহে পরিণত করেছে। ইসরাঈলের চৌকিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলিম দেশগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে।

অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রপ্রভু মুসলমানদের এসব জাতীয় স্বার্থের শত্রুদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে মধ্য প্রাচ্যের সমস্যাকে আরো জটিলতর করে তুলেছে। এই আরবের বুকেই বিশ্ব কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক শরীফ হুসাইনের জন্ম এবং তাদের সামনে তার বিশ্বাসঘাতকতার মর্মান্তিক পরিণতির জ্বলন্ত ইতিহাস থাকতেও তারা সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। এরা ইহুদী এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রিত শক্তিগুলোর নির্লজ্জ দালালী করে মুসলিম স্বার্থের বুকে অহরহ ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানে এসব গদিবাদী রাষ্ট্রপ্রভুরাও একটা মস্তবড় অন্তরায়।

ইতিহাস সাক্ষী, অতীতে ফিলিস্তিন উদ্ধারের জন্য আরবরা বিভিন্ন প্রকারের সশস্ত্র সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়েছে। কিন্তু পরাশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা, আন্তর্জাতিক অবৈধ চাপের নিকট নতি স্বীকার এবং সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ফিলিস্তিন আজও আরবদের নাগালের বাহিরে। আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনী আরব মুসলমানদের মাতৃভূমি উদ্ধারের সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী প্রধান সংগঠনটি পরাশক্তির করুণা লাভের আশায় ইসলামের আদর্শের চেয়ে সেকুলারিজম ও কম্যুনিজমকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমানে এটি পাশ্চাত্যের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত ভূ-খণ্ডের ওপর জেকে বসা ইসরাঈল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে ক্ষুদ্র গাজা ভূ-খণ্ডের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিয়ে ইহুদীদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে প্যারিস, রোম, নিউ ইয়র্ক, ওয়াসিংটন ছুটছে।

মধ্য প্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে হলে আরবদের চিন্তা-চেতনায়ও ব্যাপক পরিবর্তন অপরিহার্য। দীর্ঘ দিনের পাশ্চাত্যের ইসরাঈল সম্পর্কিত ভূমিকা থেকে স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য ইসরাঈলের স্বার্থের কোন ব্যাঘাত ঘটুক বা তার অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয় এমন কোন শর্তে শান্তি স্থাপন করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। সুতরাং তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ইসরাঈলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হবে আরবদের পক্ষে বড় পরাজয়, তাহবে হাজার হাজার শহীদ ফিলিস্তিনীর রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। যে বিষ ফোঁড়ার সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে এত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আরব জাতির দেহে পচন ধরেছে সেই বিষ ফোঁড়াকে সমূলে ধ্বংস করাই মধ্য প্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরবদের অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পাশ্চাত্যের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে বীর কেশরী সালাউদ্দিন আইউবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। ইসলামকে রক্ষা নয় ইসলামকে আকড়ে ধরেই নির্ভিক চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ পানে।

আমার দেশের চালচিত্র

ফারুক হোসাইন খান

এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ শাইখুল হাদীস মাওঃ আজিজুল হক সাহেব দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ইস-লামের ঝাণ্ডাকে বাতিল ও কুফরের প্রসাদ শীর্ষে উত্তোলন করার আন্দোলনে অমিততেজা এক বিপ্লবী পুরুষ। যার নামে থর থর করে প্রকম্পিত হয় বিশাল ভারতের ব্রাহ্মণ শাসকদের হৃদয় থেকে প্রসাদের ভীত পর্যন্ত। কিন্তু এদেশের এই অগ্নি-পুরুষ, ইসলাম প্রিয় মানুষের মধ্যমনিকে কেন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল? এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে কেন কারা যন্ত্রণা দেয়া হল? কি ছিলো তার অপরাধ? তিনি কি রাষ্ট্র বিরোধী বা সরকারের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক কোন কাজ করেছেন? তিনি কি রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, ভাংচুর চালিয়েছেন, বিচার ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে আইন-শৃঙ্খলা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন, প্রতিপক্ষকে খতম-নির্মূল করার শ্লোগান নিয়ে রাজপথে নেমেছেন নাকি জাতিকে বিভক্ত করার কুমতলব নিয়ে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন যাতে দেশে একটা গৃহযুদ্ধ লেগে যায়?

ইসলামী ঝাণ্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা, ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা বা মজলূম মুসলমানদের পক্ষেকথা বলাইকি তার অপরাধ? কাপালিকদের বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদ করাই কি তার দোষ হয়ে গেল?

বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে ও মসজিদ পুনঃনির্মানের দাবীতে তিনি যে লং মার্চ করেছিলেন তাতে গুলি বর্ষণ করে তরতাজা মুজাহিদদের খুন ঝরানো হয়েছিল। সেই বাবরী মসজিদ ভাঙার নেপথ্যের নায়ক নরসীমা রাওজীর প্রত্যক্ষ মদদে মসজিদ ভাঙার তাণ্ডবের পর পুরো ভারতের হাজার হাজার মুসলমানের রক্তের নদী বইয়ে দেয়া হয়েছে। ভূলুণ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য মুসলিম নারীর ইজ্জৎ। মানবতার মহা দুশমন যে আর্য ব্রাহ্মণ আমাদের স্বজাতির এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য দায়ী তার ঘৃণিত ও অপবিত্র পদযুগলকে এদেশের মাটিতে স্থান দিয়ে এদেশের মাটিকে অপবিত্র করতে দিতে চাননি বলে মাওঃ আজিজুল হক সহ বহু নেতা কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি চানক্যদের গঙ্গার পানি নিয়ে রাজনীতি ও ফারাক্কা বাঁধকে আমাদের মৃত্যু ফাঁদে পরিণত করার আর্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা নিচ্ছিলেন বলে তাকে জেলের অন্ধকার প্রকোষ্টে বন্দী করা হয়। পার্থিব স্বার্থ ও ব্যক্তি-মর্যাদার পতি লক্ষ করে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মর্যাদাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে জেলের জুলূম সহ্য করতে হয়। এই একই অপরাধে (!) ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নবীন প্রবীণ আরও বহু নেতাকে বন্দী করা হয়।

কিন্তু কেন এই অবিচার? আমরা কি এতই নিকৃষ্ট হয়ে গেছি যে বৃহৎ শক্তি বলে ভারতের অন্যায়ের প্রতিবাদ করারও অধিকার আমাদের নেই। আমরা কি আজীবন ভারতের ইচ্ছের বেদীমূলে বলি হতে থাকব? আমাদের দাম্ভিক ও জালিম শক্তির কাছে সর্বক্ষণ মাথা নত করে থাকার আত্মঘাতী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কেন? শাসকের গদীতে আসীন ব্যক্তিগণ আমাদের ভীরু ও কাপুরুষ করে গড়ে তোলারই বা কোশেশ করছেন কোন উদ্দেশ্যে?

ইসলামের চিরন্তন দাবী, বিশ্বের কোন অঞ্চলে একজন মুসলমান নির্যাতিত হলেও বাকী বিশ্বের মুসলমানরা তাদের উদ্ধারে জিহাদ ঘোষণা করবে। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক হয়েও আমাদের সরকারের সে দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছে বা সাহস কোনটাই ছিল না। উপরন্তু, মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনায় শোকাহত মুসলমানদের দমন করে আমাদের এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, ঈমান, ইসলাম ও মানবতার পক্ষে কথা বলা মহা অপরাধ। শাইখুল হাদীস সাহেবকে জেলে পুরে পুনরায় প্রমাণ করেছে যে, এদেশে ভারতের অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ও ইসলামের আদর্শ প্রচারকারীর পুরস্কার কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ট।

তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আমরা কি ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছি যে, তাকে সব ব্যাপারে তোয়াজ করে চলতে হবে? তার ইচ্ছে মাফিক আমাদের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলবে। তার হুকুম ছাড়া এদেশে একটা পিনেরও পতন ঘটবে না? আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা কি ভারতের দাদা বাবুদের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে যে তারা আমাদের ওপর মাতুব্বরি করতে চায়, আমাদের ন্যায় ও সত্য বাক্য উচ্চারণে বাধা প্রদান করতে চায়? বাংলাদেশের স্বাধীনতার কি কোন কানাকড়ি মুল্য নেই কাপালিক ও চাড়াল-চামুণ্ডাদের কাছে?

মূলত ভারতের শাসন ক্ষমতায় দাম্ভিক ও মানবতা বিবর্জিত ব্রাহ্মণরা আসীন থাকায় তারা যে পরিমাণ না দম্ভ দেখায় তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী দম্ভ দেখাতে আমরা উৎসাহিত করি, সুযোগ করে দেই। এদেশের আলো, বাতাসে লালিত পালিত এক শ্রেণীর 'বন্দে মাতরম' ভক্ত ও ইণ্ডিয়ান

ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট ভোজীরা এদেশকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার তোড়-জোর করায় তাদের ঔদ্ধত্যের মাত্রা বেড়ে গেছে। এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর কাপালিকদের চাপিয়ে দেয়া সকল প্রকার হস্তক্ষেপ প্রশাসনের মধ্যমনিরা অবলীলাক্রমে মেনে নেয়ায় এবং তাদের সকল প্রকার অবৈধ ইচ্ছার নিকট আমাদের সরকার নতজানু ভূমিকা পালন করায় দাদা বাবুরা আমাদের সিকিম, ভুটান ঠাওরাচ্ছে।

এরই নামকি স্বাধীনতা, একেই কি বলে জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেম? নিজের মনের কথাটি যদি দাম্ভিক শক্তির ভয়ে বলতে না পারলাম, নিজের পথে চলতে যদি তস্করদের ভয়ে হাটু ঠকঠক করে, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে যদি বুক কাঁপে, মুখে তালা ঝুলিয়ে দিতে হয় তবে সে স্বাধীনতার মূল্য কোথায়? এমন ভীত কাপুরুষোচিত কার্যকলাপ কি দেশপ্রেম না দাসত্ব? স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল না পাওয়া গেলে সে স্বাধীনতার আদৌ কি প্রয়োজন আছে?

দেবতার আসনে বসে যারা দেশ শাসন করে তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। তারা শুধু শাসনই করে জনগণের কাছে জবাবাদিহি করতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। ব্যক্তি চিন্তার কাছে জনতার মতামতের কোন মূল্যই তাদের কাছে নেই। তারা ভুলেই বসে আছে যে, আমরা মুসলমানরা সেই সব জাতি থেকে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র যারা নিজ নিজ ধর্মকে বিকৃত করেছে। ব্যক্তি স্বার্থ ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে অপব্যাখ্যা ও শোষনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। স্বার্থের কাছে ধর্ম একান্ত তুচ্ছ, কিন্তু সাচ্ছা মুসলমানদের নিকট ঈমান, ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। জালিম যত বড় শক্তিই হোক তার কাছে মাথা নত করা মুসলমানের ধর্ম নয়। ভীরুতা ও কাপুরুষতা তাদের কাছে একান্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। ইসলাম একদিকে শান্তির ধর্ম প্রয়োজনে শক্তিরও ধর্ম। ভৌগলিক সীমা, রাষ্ট্র, বর্ণ প্রথা ইসলামে একেবারে অচল। তাই বিশ্বের এ প্রান্তের মুসলমান অন্য প্রান্তের বিপদগ্রস্থ মুসলমানের পাশে দাড়াতেও কুন্ঠিত হবে না। ঈমানের এই দাবীকে বাস্তবায়িত করার জন্য যত বাধাই আসুক তা 'সে উপেক্ষা করবেই। আমাদের জাতীয় নীতি নির্ধারকদের এই ঈমানী চেতনার অভাবে ইসলাম বিরোধী তৎপরতার প্রতিবাদ করায় মুসলমানের হাতে মুসলমানরা নির্যাতিত হওয়ার মত লজ্জাস্কর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। ইসলামের ইতিহাসের উজ্জল জৌতিষ্ক আজম ইমামে হযরত আবু হানিফা (রহঃ), হযরত আনাস ইবনে মালেক (রহঃ) ও হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ ব্যক্তিসহ যুগে যুগে অংসখ্য মুসলিম মনীষী ইসলামের আদর্শের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসলিম শাসকদের রোষালে পড়ে কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছেন বছরের পর বছর ধরে।

ইতিহাস কিন্তু ন্যায় বিচার করতে ভুল করেনি। ইসলামের জন্য তাঁরা যে নির্যাতন ভোগ করেছেন তা' যুগে যুগে মুসলমানদের অন্যায়ের বিরুধে প্রতিবাদ করে হাজারো কষ্ট স্বীকারে প্রেরণা যুগিয়েছে। পক্ষান্তরে, তাঁদের ওপর জুলুমকারীরা জালিম হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছেন। দুর্ভাগ্য মানুষের শিক্ষা নেয়ার জন্যই ইতিহাস রচিত হলেও আমাদের সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে ইচ্ছুক বলে মনে হয় না।

সুতরাং এই দেশের ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমরা যারা চিন্তিত এই মুহূর্তে তা' আগ্রাসী শক্তির থাবা থেকে মুক্ত রাখতে তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। শায়খুল হাদীস জনাব আজিজুল হক সাহেবের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয়, জাতি ও দেশ প্রেমিক ব্যক্তির ন্যায় আর কোন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে দেশের ও জাতির পক্ষে কথা বলার জন্য হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার না হতে হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, মনের ভাষাকে প্রকাশ করতে চাই কারো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া। কোন দাম্ভিক শক্তি আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে যদি পুতুল খেলায় মত্ত হতে চায় তবে তার অশুভ হাত দুটোকে ভেঙ্গে দিতে দয়ার দুর্বলতা দেখাতে রাজী নই। আমরা বুক ফুলিয়ে আমাদের ঈমানী অস্ত্র চালিয়ে দাম্ভিক শক্তিকে ঝাঝরা করে দিতে মোটেই অক্ষম বা ভীত নই। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার, কার বাপের সাধ্য আমাদের সে অধিকারে নাক গলায়। হাজার বছরের গোলামীর চেয়ে একদিনের স্বাধীন জীবনও আমাদের কাছে মহা মূল্যবান।

অতএব স্বাধীনতার এই অমিয় মন্ত্রে আমাদের উজ্জিবীত হতে হবে, দেশ প্রেমের নব চেতনা নিয়ে আমাদের সীসা ঢালা প্রতিরোধ প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে স্বাধীনতার বিরোধী আগ্রাসী শক্তি ও তাদের এদেশী দোষর শকুন-শকুনীদের নাকের ডগার ওপর। কোথায় সেই অকুতোভয় স্বদেশ প্রেমিক যোদ্ধাদের কাফেলা?

এই বাংলাদেশের আলো বাতাসে লালিত পালিত হয়ে, বাংলার বুকে জন্ম নিয়ে একটি মহল বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলার চক্রান্ত করছে! মদীনার ইসলাম, রাসূল (সাঃ)-এর ইসলাম, আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ইসলামের ওপর ছুরি চালিয়ে, ইসলামের অপরিহার্য ডালপালাগুলোকে ছেটে ছুটে মোঘল দানব আকবরের 'দ্বীনে ইলাহী' কিসিমের এক নতুন দণ্ড-মুণ্ডহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে সরল সহজ মুসলামানদের ঈমানকে হরণ করার পায়তারা করছে উক্ত মহল। এদের পূর্ব সূরীরা যুগে যুগে আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর ভূমিকা পালন করে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে এরা মোনাফেক, জাতির গাদ্দার

হিসেবেই সুপরিচিত। এরা মুসলিম নামে মুসলিম সমাজের মধ্যে মিলেমিশে থেকে ইসলামের শত্রুদের এজেন্ট হিসেবে বিভীষণের ভূমিকা পালন করত। সেই মোনাফেক গোষ্ঠীর এদেশীয় সার্থক উত্তরাধীকারী হলো সেকুলার এবং বামপন্থী হিসেবে পরিচিত মহলদ্বয়ের অন্তর্ভূক্ত মুসলিম নামাবলী অলংকৃত আদম সন্তানগণ। এরা এই মুসলিম দেশেটিতে পাশ্চাত্য থেকে ধার করে আনা সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নতুন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটি পাশ্চাত্যের জঠর থেকে উণিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। এর জন্মদাতারা যখন এটি জন্ম দেন তখন ইউরোপে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা নিয়ে চলছিল প্রচণ্ড বিতর্ক। খৃষ্টধর্মে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকায় গীর্জার পাদ্রীরা খেয়াল খুশিমত আইন করে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে জনগণকে শাসনের নামে উৎপীড়ন চালাত। তাদের শোষণের যাতাকলে পৃষ্ঠ হতে হতে এবং ধর্মকে বিজ্ঞান ও প্রগতির ঘোর বিরোধীর ভূমিকায় দেখে এক সময় ইউরোপের পুরো খৃষ্টান সমাজ ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে পাদ্রীদের যুগ যুগ ধরে শোষনের ফলে এক সময় তারা ঈশ্বরের অস্থিত্ব নিয়েও শংসয় প্রকাশ করতে শুরু করে। ক্রমে শংসয়বাদীদের সংখ্যা বাড়তে থাকায়; তারা একসময় সকল অনাচার ও নিপীড়নের হোতা ঈশ্বর-পুত্র পাদ্রীদের কার্যকলাপ গীর্জার চার দেয়ালের মধ্যে সীমিত করে দেয়। জেকব, হলিয়ক, ব্রেডলাক, সাউথ ওয়েল, থমাস কপার প্রমুখ দার্শনিকদের থিউরি অনুযায়ী এবং পরবর্তিতে আরও বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রবক্তাগণের দলাই-মালাই, ঘষা-মাজার পর রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মের প্রভাবহীন আধুনিক সেকুলারিজম। এর মূল কথা হল 'রাষ্ট্র তার রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন হবে ধর্মের প্রভাব মুক্ত। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবেনা। রাজনীতি, অর্থনীতি সংস্কৃতি ও প্রশাসন এসব ইহজাগতিক ব্যাপার-স্যাপার। সুতরাং এগুলো ইহজাগতিক আইন-কানুন, নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হবে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। ধর্মের লক্ষ্য পারলৌকিক মুক্তি। সুতরাং তা ব্যক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত ধর্মহীন সিলেবাস অনুযায়ী লেখাপড়া করে বুদ্ধিজীবী বনে যাওয়া এদেশীয় মুসলমানের সন্তানেরা বেশ ভাল করেই রপ্ত করে নেয় পাশ্চাত্যের এই উদ্ভট ও ধর্ম বিরোধী বক্তব্যকে। ওরা পাশ্চাত্যের আস্তিকতা ও নাস্তিকতার মধ্যে সংঘাতময় পরিবেশের ছাচে ফেলে ইসলামকে বিবেচনা করতে থাকে, মুসলমানদের ধর্মীয় মনীষীদেরকে মূল্যায়ন করতে থাকে পাশ্চাত্যের শয়তানের প্রতীক প্রাদ্রীদের কতারে ফেলে। সভা-সমাবেশ, মিছিল মিটিং সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও প্রচার মাধ্যমে যখনই সুযোগ পায় গলাবাজী করতে থাকে "মৌলবাদ নির্মূল কর, ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ কর, মসজিদে রাজনীতি বন্ধ কর, রাজনীতি থেকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা কর" ইত্যাদি। কিন্তু ওরা ক্ষুণাক্ষরেও একটু মাথা ঘামায়নি যে, সেকুলারিজমের উৎপত্তি হয়েছে পাশ্চাত্যে। পাশ্চাত্যের ধর্মান্ধ্য ও স্বার্থান্ধ্য পাদ্রীদের অপকর্মের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্যই সেকুলারিজমের উৎপত্তি। ইউরোপের যে সমস্যার জন্য এর জন্ম আমাদের দেশে তেমন কোন সমস্যা নেই। ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী নয়। এদেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবীরাও সভা-সেমিনারে দাবী করেন যে, "একদল ধর্ম ব্যাবসায়ী ধর্মের নামে ব্যবসা করে এবং ধর্মের নামে রাজনীতি করে, মসজিদসহ সকল ধর্মীয়স্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে, জনগণকে শোষণ করে। কিন্তু ধর্ম পবিত্র জিনিস, রাজনীতির সাথে একে মিলিয়ে ফেললে ধর্মের, ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতা নষ্টহয়।" "ইসলাম ধর্ম পরধর্ম সহিষ্ণু, অন্য ধর্মের ব্যাপারে ইসলাম হস্তক্ষেপ করে না" ইত্যাদি।

সুতরাং ইসলামের পর-ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে যারা এত সুন্দর ফতোয়াবাজী করেন তারা কেন সেই ইসলামকে বাদ রেখে পাশ্চাত্যের একটা মনগড়া মতবাদ কায়েমের ঠিকাদারী নিয়েছেন। তাদের ভাষায় ইসলামের ন্যায় পবিত্র জিনিসটা নিয়ে কিছু সংখ্যক দুষ্ট লোক ব্যাবসা করেন, শোষন করেন, মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করেন। কিন্তু তারা কেন ধর্মের মত পবিত্র জিনিসটা ঐ সব খারাপ (!) লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন না? কেন ধর্মকে খারাপ লোকদের হাতে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছেন? আসলে রাজনীতি কি একটা মহা অপবিত্র জিনিস যা ধর্মের সাথে মিশাঙ্গে ধর্মকেও অপবিত্র করবে, মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে? তাহলে এমন মহা অপবিত্র জিনিস নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তারা নিজেদের কেন সমাজের চোর ডাকাতের ন্যায় 'দাগী' হিসেবে চিহ্নিত করছেন, ভালো মানুষরা কি অপবিত্র জিনিস পছন্দ করতে পারে?

ওদের কাছে এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। ওদের মন-মানসিকতা অন্যের কাছে বাধা। ভাল মন্দ বিবেচনা করার ওদের নিজস্ব কোন জ্ঞান নেই। ওদের মিশনই হল পাশ্চাত্যের প্রভূদের সেকুলারিজম আমদানী করে তার বাংলা তরজমা এদেশে কায়েম করা। ওরা নিজেদের তথাকথিত গণতন্ত্রের পোদ্দার বলে জাহির করে যে, গণতন্ত্রে নাকি সকলের মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতার কথাও বলা হয়। ওনারা সে গণতন্ত্রের কথা বলে সমাজতন্ত্র ও ধর্মবিরোধী একটা মতবাদ জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে গলাবাজী করতে পারলে ধর্মের ভিত্তিতে কেউ রাষ্ট্র ও সমাজ

গঠন করার মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন না কেন? তাদের অপরাধ কি তাদের 'মৌলবাদী' 'প্রগতি বিরোধী', 'পশ্চাৎপদ', ধর্ম ব্যবসায়ী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তাদের কণ্ঠ রোধ করার নির্মূল করার অগণতান্ত্রিক তৎপরতা চালানো হয় কেন? ধর্মনিরপেক্ষতার নট-নটীরা জবাব দিবেন কি?

পাশ্চাত্যের অধিকাংশ লোকজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, পরকাল সম্পর্কে তারা একেবারেই নির্বোধ। তাছাড়া খৃষ্টধর্মকে আধুনিকী করণের সময় পাদ্রীরা পুরো খৃষ্টজগতের সামনে একটা ধারণা পেশ করে যে, "যিশু খৃষ্ট শুলে চড়ে আত্মত্যাগ করেছেন পুরো খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা সংগঠিত অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ব করার জন্য। সুতরাং ভবিষ্যতে কোন খৃষ্টান হাজারো পাপ করলেও তা আর পাপ বলে বিবেচিত হবে না। ঈশ্বরের দরবারে তা' আগেই মোচন হয়ে গেছে।"

পাশ্চাত্য জগত এই উভয় ধ্বংসাত্মক ধারণার বশবর্তী হয়ে পাপের কোলে নিজেদের সপে দিয়েছে। খেয়াল খুশিমত রাষ্ট্র ও সমাজকে শাসন-শোষন করার দণ্ড হাতে তুলে নিয়েছে। জীবনকে তারা দুটি ভাগে ভাগ করেছে। এক ইহজাগতিক ও অন্যটি পারলৌকিক। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এসব কর্মকাণ্ড ইহলৌকিক এবং ব্যক্তিগত ধর্ম পালন এটা পরলৌকিক। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক তৎপরতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যক্তিকে পরকালে কোন জবাব দিতে হবে না। কিন্তু ইসলাম কি ঐসব খৃষ্টান মতলববাজদের সাথে একমত? হাদীসে আছে, "দুনিয়া হচ্ছে পরকালের কর্মক্ষেত্র। মানুষ দুনিয়ার কর্মফল পরকালে ভোগ করবে।" সুতরাং একথা কি বলা যায় যে, মানুষ শাসক হয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে দুর্বলকে হত্যা করবে, প্রশাসনে থেকে ঘুষ-দুর্নীতি, ব্যভিচার-অশ্লিলতা, মদ্যপান করবে কিন্তু আল্লাহ্ এর কৈফিয়ত চাইবেন না বা চাইতে একেবারেই অক্ষম?

ইসলামে কি কাউকে প্রভু সেজে, আইন করে অন্য মানুষকে গোলামের ন্যায় শাসন করার অধিকার দেয়া হয়েছে? ইসলামের দ্বিতীয় রোকন যাকাত—যা আদায় করা সম্পর্কে কুরআনের বহু স্থানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের শাসন কর্তা ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবেন এবং এভাবে রাষ্ট্রের অর্থনীতির মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখবেন। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অনুসৃত অর্থনীতির কাঠামোতে যাকাত উপেক্ষা করা হয়। কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চোরের হাত কাটা এবং ব্যভিচারের জন্য বেত্রাঘাত বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যা' ইসলামী সরকার না থাকলে কার্যকর করা সম্ভব নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে একে অমানবিক ও মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ সরাসরি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত। বোধগম্য নয় যে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান উল্লেখ থাকার পরও এ দেশীয় সেকুলার পণ্ডিতরা কোন প্রত্যাদেশের জোরে ইসলামকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ফতোয়া দিচ্ছে। নিজেরা ইসলামের ফরজ বিধান অস্বীকার করছে অন্যকেও অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে তাদের ঈমান লুটে নেয়ার তৎপরতা চালাচ্ছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মদীনার মূল ইসলামকে রাষ্ট্র ও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে তাদের 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছে যে, এদের চিন্তা চেতনা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। মদীনার মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এ যুগের জন্য একটা মস্তবড় অপরাধ!

সেকুলার পন্থীরা যতই ধর্মের দোহাই পারুক, হজ্জ করুক আর নামাজ পড়ুক ওরা মুলতঃ ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন, ওদের তৎপরতা ইসলামের মৌলিক অস্তিত্বের জন্য ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ্ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (মায়েদা-৩)

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেয়ার পর সে ব্যাপারে কোন মুমেন নারী-পুরুষের কোন ইখতিয়ার থাকে না।" (আল আহযাবঃ ৩৬)

"আল্লাহর নাযিল করা যাবতীয় বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের, যালেম তারা ফাসেক।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৪-৪৭)

"ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান"। (আলে ইমরান-১৯)

"ইসলাম ব্যতীত যদি কেউ অন্য কোন জীবনাদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহ্ কখনও তা' গ্রহণ করবেন ন।" (আলে ইমরানঃ ৮৫)

সুতরাং ইসলামকে শুধু মাত্র ব্যক্তি জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ করার চেষ্টা আল্লাহ্র উল্লেখিত ঘোষণার সরাসরি লংঘন। আল্লাহ আমাদের পূর্ণাঙ্গজীবন যাপন করার জন্য আল কুরআন প্রেরণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) এই পবিত্র গ্রন্থখানাকে সংবিধান করে ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব কাঠামো তৈরী করে সে অনুযায়ী আমাদের পথ চলার নির্দেশ করেছেন। অতএব আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি যে, আল্লাহ্ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাপন করার বিধান তৈরী করতে পারলেন, পরকালে এর কৈফিয়ত নেয়ারও ব্যবস্থা রাখলেন কিন্ত মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজের বিধান দেয়ার সামর্থ তাঁর ছিল না এবং পরকালেও এর কৈফিয়ত নিতে পারবেন না!

সর্বশেষে বলতে হয়, সেকুলার মতবাদ ইসলাম সমর্থিত নয়। এর জন্মদাতা পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টানেরা। তাদের

মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী বন্ধু মনে করে তাদের মতবাদকে তারাই গ্রহণ করবে যাদের চরিত্র স্বয়ং আল্লাহ্‌ই তুলে ধরেছেন, "হে ঈমানদারগণ; ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করোনা। এরা নিজেরা পরস্পর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করে তবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।" (মায়েদা–৫১)

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে যারা ইসলামের জন্য আন্দোলন করছেন এবং খাটি ইসলামের পথে যে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে আমাদের সেকুলার পণ্ডিতরা মৌলবাদী বলে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখছে এবং ভারত আমেরিকা, রাশিয়ার ন্যায় ইসলামের দুশমন রাষ্টগুলির সাথে গলাগলি বেঁধে তারা কুরআনের এই সত্যকেই প্রমাণ করছে।

অতএব আল্লাহ প্রেমিক ইসলামের সুগভীরমূলের সাথে সম্পর্কিত ও আস্থাশীল সত্যিকার 'মৌলবাদীদের' সচেতন হতে হবে, ইসলামের ঘরের শত্রু বিভীষনদের ধ্বংসাত্মক ছোবল থেকে ইসলামের অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রস্তুতি নিতে হবে। ওদের চিহ্নিত করে সরল সহজ মুসলমানদের ওদের ধোকা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করতে হবে। সারা বাংলার অলিতে–গলিতে, পথে–প্রান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে, "সেকুলারবাদীরা ইসলামী সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্র; যাকাত, ইসলামী শরিয়ত ও জিহাদে বিশ্বাস করে না।

ওদের এ মোনাফেকী তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের আপামর মুসলমানকে জিহাদের দাওয়াত পৌছে দিতে হবে। ঈমানী চেতনার এত ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ করতে হবে যাতে ওরা চারিদিকে মৌলবাদী ছাড়া আর কিছু না দেখতে পায়। 'মৌলবাদী' 'মৌলবাদী' চিৎকার করতে ঘটাতে যেন ওরা দম বন্ধ হয়ে গতায়ু হয়। কোথায় আছে সেই মৌলবাদের ঝাণ্ডাধারী প্রথম কাফেলা? সময় এসেছে এবার উড়াও তোমার ঝাণ্ডা।

ইয়াহুদী চক্রান্তের কবলে

(১১ পৃঃ পর)

মিশর, উগান্ডা, তিউনিসিয়া, জর্ডান, লেবাননে হাজারো সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। ইরাকের পারমানবিক প্রকল্পে ১৯৮১ সালে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থানের আশংকায়। মুসলিম জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা শাহ ফয়সালকে হত্যার পেছনে রয়েছে ইহুদী চক্রান্ত। ইহুদী সংস্থা মোসাদ সারা বিশ্বে মুসলমানদের হত্যা করার জন্য মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলোকে ট্রেনিং দিচ্ছে। কাশ্মীরে মুজাহিদ দমনে মোসাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে এবং ভারতীয় বাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে। শ্রীলংকার তালিম বিদ্রোহীদের তামিল মুসলমানদের হত্যার ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের ট্রেনিং দাতা মোসাদ। বার্মায় রোহিঙ্গা বিতাড়নে বর্মীবাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে মোসাদ। বসনিয়ায় মুসলিমদের হত্যার জন্য সার্বদের ট্রেনিং দেয়াসহ তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে এই মোসাদের গোয়েন্দারা। যেখানেই ইসলাম বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে ইহুদীদের চরেরা সেখানেই উপস্থিত হচ্ছে। ইদানিং এই দেশে ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের ইসলামী আন্দোলন ঠেকানোর কসরতের জন্য যে উগ্রবাদী সংগঠনটি গজিয়ে উঠেছে তার জন্মদিনেও একজন মার্কিন ইহুদী টমাস টিকিটিং এটর্নীর আইডেন্টি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

গোটা মুসলিম বিশ্বে আজ ইহুদী চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে পড়েছে। বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, আরববাদ প্রভৃতি বিভ্রান্তির মাধ্যমে তারা মুসলিম বিশ্বকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য হাজারো চেষ্টা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে ভাবতে হবে। পৃথিবী আজ দুটি দলে বিভক্ত। এক হিযবুল্লাহ আর অন্যটি হিযবুশ শয়তান। হিযবুশ শয়তান সর্বদাই সুযোগ সন্ধানী এবং ঈমানদারদের ধ্বংস করতে তৎপর। আধুনিক ইহুদী ও খৃষ্টান শক্তি হিযবুশ শয়তানেরই অন্তর্ভুক্ত। এদের হাত থেকে ঈমান, ইসলামকে রক্ষা করতে হলে হিযবুল্লাকে অবশ্যই প্রতিরোধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ঈমানদার ও শয়তান কখনো এক পথে চলতে পারে না; তাদের মধ্যে কোন সমঝোতা হতে পারে না। ধ্বংস অথবা বশ্যতাই হিযবুশ শয়তানের ভাগ্যের অখণ্ডনীয় লেখা। আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের হাতেই তাদের শাস্তি দিবেন।

ঈদযযোহা

(৮ পৃঃ পর)

উদযাপন করি, সে সময় বিশ্বের দিকে দিকে আমাদের মুসলমান ভাই–বোনেরা নমরূদী শক্তির হাতে যবেহ হতে থাকে। ঈদুল আযহার কোরবানী অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করে তুলতে হলে, প্রতিটি কোরবানীদাতাকে আগে নিজের খোদাদ্রোহী ও স্বার্থপর কুপ্রবৃত্তিকে কোরবানী দিয়ে নিজ সমাজ থেকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাজনিত অন্যায়–অবিচারকে উৎখাত করতে হবে এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর ন্যায় ঈমানী তেজ, সংগ্রামী চেতনা নিয়ে নমরূদী পশুত্বের হাত থেকে মানবতাকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে বাঁচত হবে।

কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল

আল্লাহর সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর আমীর এসময় কাশ্মীরের বাইরে ভারতের অন্যত্র সফরে ছিলেন। আজমল তার সফর সংগী। ফোনে তারা আমার পৌছার খবর পেয়ে সফর সংক্ষিপ্ত করে শ্রীনগর ফিরে আসে। আমরা এক গোপন মিটিংয়ে কেন্দ্র থেকে দেওয়া প্রোগ্রাম নিয়ে পরামর্শে বসি। তাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এখানে একটি পরিপুর্ণ ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হবে। সেখানে সকল সাথী একত্রিত হওয়ার পর পরবর্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

হরকাতের আফগানিস্তানের ট্রেনিং ক্যাম্পে অনেক কাশ্মীরী মুজাহিদ ট্রেনিং নিয়ে কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারা ইতিমধ্যে বহু সফল অভিযানে অংশ নিয়েছে। তবে বিশেষ কারণে তারা তাদের সংগঠনের নাম প্রকাশ করা থেকেবিরতরয়েছে।

এবার নতুন সেন্টারে পুরাতন সাথীদের সাথে সাথে নতুন সাথীদেরও আফগান ক্যাম্পের নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একই নিয়ম ও পদ্ধতিতে ট্রেনিং চলছে। কখনও দৌড় ঝাপ, কখনো অস্ত্রের ট্রেনিং যুদ্ধের মহড়া এর পর কুরআন ও ইমান আকীদা বিষয়ক দরস। সাথে সাথে পাহারাদারী ও মরিচা খেদাইও করানো হচ্ছে। ভোর রাতে সেজদায় পড়ে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কান্না কাটি করা একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সর্ব প্রথম ট্রেনিং সেন্টারের হেফাজতের ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং এক ডাকে সব মুজাহিদ কমাণ্ডারের কাছে জমা হই। চতুর্দিকে দূর পর্যন্ত মরিচা খোদাই করা হয়। ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার পথের দুই ধারে ওয়ারলেসসহ কড়া পাহারা বসান হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই ট্রেনিংয়ের কাজ পুরো দমে শুরু হয়। দেখতে দেখতে সকল পুরাতন সাথী সেন্টারে পৌছে যায়। আমাদের টেনিংয়ের ধরণ দেখে অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপ দলে দলে তাদের সাথীদের আমাদের কাছে পাঠাতে শুরু করে। মুজাহিদদের অধিকাংশ গ্রুপ থেকে আমাদের মারকাজের প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার জন্য ভুয়সী প্রশংসা পত্র আসতে থাকে। মূলত আমরাই (হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী) সর্ব প্রথম কাশ্মীরে পরিপূর্ণ টেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই।

টেনিংয়ের প্রোগ্রাম গতিশীলভাবে এগিয়ে চলছিল। এমন সময় পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে ক্রেক ডাউন হয়। এবার এই ক্রেক ডাউনে অংশ নেয় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ। তারা গ্রামের এক ছেলেকে ধরে মার পিট করলে সে তাদেরকে বলে দেয় যে, আমাদের এখানে কিছু আফগান মুজাহিদ ঘোরা ফিরা করছে।তার কথামত একজন গুপ্তচরসহ রিজার্ভ পুলিশের সদস্যরা আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়। তাদেরকে আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে দেখে আমাদের পাহারাদার সাথী ওয়ারলেসের মাধ্যমে ত ৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট সে খবর পৌছিয়ে দেয়। এ খবর শুনে ক্যাম্পের মুজাহিদরা খুশীতে আটখানা। বহুদিন ধরে তারা এমনই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গলা জড়িয়ে একে অন্যকে তারা মোবারকবাদ জানিয়ে বলে, ওদেরকে এমনই শিক্ষা দেওয়া হবে যে, কাশ্মীর জবরদস্তি দখলে রাখায় কত মজা তা আজ বুঝিয়ে দিতে হবে। একটি লড়াইয়ের জন্য সকল প্রস্তুতিসহ সবাই অপেক্ষা করছে। শিকার নিজে এসে ধরা দিচ্ছে বলে ব্যাস্তভাবে সবাই মরিচা সামলানসহ প্রতিরোধ শক্তি মযবূত করতে থাকে। স্থির হল, তাদেরকে ক্যাম্পের মধ্যে ঢোকার পর ঘেরাও করে সব খতম করা হবে। কাউকে জিন্দা ফিরতে দেওয়া হবে না।

এদিকে গ্রাম থেকে এক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর ভাড়াটে গুপ্তচর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? তারা বললো, এখানকার আফগানী ক্যাম্পে আমরা হামলা করব। এ কথা শুনে সে বিস্ময়ের সাথে বল্লো, "সে কি করে সম্ভব! আপনারা সংখ্যায় এত কম আর আফগানীরা সংখ্যায় অনেক। উপরন্তু তাদের রয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ। তারা মারকাজে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র তাক করে রেখেছে। আমার মনে হয়, সেখানে গেলে কেউ জেন্দা ফিরে আসতে পারবে না। রিজার্ভ পুলিশের এই গ্রুপ কাশ্মীরে এই নতুন এসেছে। তারা কিছু একটা করে নিজেদের বাহাদুরী জাহির করতে চায়। তারা বল্লো, কোন চিন্তা করো না, আমাদের সাথেও দেড় হাজার বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সিপাহী আছে। তাছাড়া আফগানীরা অন্যদেশ থেকে এসেছে। মানসিকভাবে তারা বহু দুর্বল। এখানে তারা আত্ম বল নিয়ে লড়ার সাহস পাবে কই? রিজার্ভ পুলিশ আরো অগ্রসর হলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা তা জানতে পেরে গাড়ি নিয়ে সরাসরি তাদের সামনে এসে রাস্তা রুখে দাঁড়ায়। তারা বলে, ক্রেক ডাউন শেষ হয়েছে এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে যান। তবুও তারা অগ্রসর হতে চাইলে সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা বলে এই ক্যাম্পে হামলা করতে হলে পাঁচ সাত হাজার সৈন্যসহ

আরও বহু আধুনিক অস্ত্রের দরকার।

অগত্যা তারা ফিরে গেল। যাওয়ার পথে গ্রামবাসীদের বলে গেল, তোমরা আফগানীদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলো, অন্যথায় তাদের বাঁচার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একথা আমরা জানতে পেরে জবাবে বলা হলো, আমরা দশদিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো। আমরা মারকাজ থেকে দশ মাইল পর্যন্ত বাইরে এসে তোমাদের সাথে লড়াই করবো। তোমরা যত সৈন্য ও মারণাস্ত্র নিয়ে আসতে পার আস। এই পয়গাম দুশমনদের এত ভীত করে দিয়েছিল যে, দশ দিন পর্যন্ত তারা এদিকে পা-ই বাড়ায় নি। এদিকে আর একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে যায়। ক্রেক ডাউন তুলে সৈন্যরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তখন পাঁচজন সশস্ত্র মুজাহিদ ওই রাস্তা দিয়ে ক্যাম্পের দিকে আসছিল। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তারা রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকে। গাড়ি চলে যাওয়ার পর রাস্তার উপর উঠে হরকাতুল জিহাদের নির্ভিক মুজাহিদরা সামনে আগাতে থাকে। "সামনে চল" এই রণ সংগীত তারা কোরাস গলায় গাইতে গাইতে রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে থাকে।

ওই গাড়ির পিছনে আর একইট গাড়িতে একশ চল্লিশজন সিপাহীর একটি পদাতিক দল ধেয়ে আসছিলো। পাঁচজন মুজাহিদকে দেখে তারা রাস্তার দুপাশে লুকিয়ে যায়। তাদের অতিক্রম করে পিছনে ফেলে আসার পর একজন মুজাহিদ পেশাব করতে বসার পূর্বে পিছনে তাকিয়ে দেখে, সৈন্যরা রাস্তার নিচে নেমে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সাথীদের ডাক দিয়ে এখবর দিলে এক জন মুজাহিদ অপেক্ষা না করে তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে সাথে সাথে চার-পাঁচ জন সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারা হতাহতদেরকে তুলে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

আমরা পরে গ্রামবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমাদের মাত্র পাঁচজন মুজাহিদকে দেখে তারা ভয়ে পালালো কেন? গ্রামবাসীদেরকে তারা বলেছে, তাদের জন্য পাঁচজন মুজাহিদের সাথে লড়াই করা কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাদের ভয় হচ্ছিল, ফায়ারের আওয়াজ শুনে পার্শ্ববর্তী মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে মুজাহিদরা সাড়াশী আক্রমণ করলে তখন তারা কেউই যে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না! দ্বিতীয়ত তাদের অন্যসব গাড়ি আগে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধে নাকি তাদের পরাজয় ছিল নিশ্চিত। তাই বৃহৎ কোন ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপর্যয়ের মুকাবিলায় তুলনামুলক অল্প ক্ষতি বরণকে তারা মেনে নিয়েছি। পালিয়ে জীবন বাঁচাতে পারাটাও কোন ছোট বিজয় কি? উপরন্তু মযবূত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরিক্ষীত চৌকস আফগান মুজাহিদদের সাথে লড়াই করার হিমৎ তাদের হয় না।

ভারতীয় সেনাদের আহবান মতে বিশ দিন পর্যন্ত আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। তাদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে এমনকি তাদের এদিকে আসার কোন লক্ষণ না দেখে কৌশলগত কারণে আমরা আমাদের ট্রেনিং সেন্টারটি স্থানান্তরিত করি।

আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে আমি পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি, যদি সেদিন ভারতীয় রিজার্ভ পুলিশ আমাদের উপর হামলা করতো তবে তারা একজনও জিন্দা ফিরে যেতে পারতো না।

নতুন যায়গায় ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের সাথে সাথে চারিদিক থেকে বিভিন্ন সংগঠনের মুজাহিদরা ট্রেনিং নিতে এখানে আসতে শুরু করে। এখানে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে দ্বীনি তালিমেরও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য সংগঠনের মুজাহিদরা আমাদের নিয়ম পদ্ধতি ও ক্যাম্পের দ্বীনি পরিবেশ দেখে আগ্রহের সাথে আমাদের সংগঠনে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। আমরা সব সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সার্থে তাদেরকে নিজ নিজ দলে থেকে কাজ করার পরামর্শ দেই।

এর ফলে সকল সংগঠনের কাছে আমরা পরম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হই। একবার আমাদের সেন্টারের দিকে ইন্ডিয়ান সৈন্যরা চুপে চুপে অগ্রসর হতে থাকলে "আল ওমরের" মুজাহিদরা তাদের দেখতে পায়। সৈন্যদের গতি দেখে তারা বুজতে পারে, আমাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের খবর না দিয়েই জীবনের ঝুকি নিয়ে পথিমধ্যে তারা সৈন্যদের গতিরোধ করে। এ লড়াইয়ে 'আল ওমর' গ্রুপের চারজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। চারজন মুজাহিদের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমাদের ক্যাম্প রক্ষা পায়।

ট্রেনিংয়ের কাজ চলছিল। এক ব্যাজ শেষ হতেই নতুন ব্যাজ শুরু হয়। এভাবে বহুমুজাহিদ ক্যাম্পে জমা হয়। তাদের আন্তরিক দাবী হলো আক্রমণ শুরু করা হোক। আমরা শুরার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলাম এখন থেকে নিয়মিত আক্রমণ চালানো হবে। তবে আক্রমণের ধরণ এমন হতে হবে, যাতে আমাদের প্রভাব তাদের প্রতি আরও বৃদ্ধি পায়। দুশমনের হৃদয় থেকে আমাদের প্রভাব এতটুকু কমে না যায়। এসময় ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে অপারেশন টাইগারে শরীক সৈন্যদের প্রতি কেন্দ্রের নির্দেশ ছিলো, যে মহল্লা থেকে তোমাদের প্রতি গুলি ছোড়া হবে সে মহল্লা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিবে। আমরাও ঠিক করলাম, কোন গ্রাম বা মহল্লা থেকে ওদের প্রতি আক্রমণ করব না। বরং খোলা ময়দানে আমরা ওদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব।

ছুরাহ পুলিশ ষ্টেশনের উপর আক্রমণঃ

শ্রীনগরে ছুরাহ ইনষ্টিটিউট নামক একটি বড় হাসপাতাল রয়েছে। তার সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বেই এক বিরাট পুলিশ ষ্টেশন। পুলিশ ষ্টেশনে কাশ্মীরী পুলিশেরও একটি ক্যাম্প আছে। তাদের পাশেই ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা এক শক্তিশালী পোষ্ট স্থাপন করেছে।

পোষ্টে দেড়শত ফৌজ থাকে।

এই পোষ্টে আক্রমণের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা দিনে সমগ্র এলাকা পরিদর্শন করে পজিশনের স্থান নির্বাচন করি।

পোষ্টের পশ্চিম পার্শে ছুরাহ ইনিষ্টিটিউট। পোষ্টের মাত্র দুটি গেট। একটি ইনিষ্টিটিউটের গেটের সোজাসুজি মেইন রোডের অপরপাশে। অপরটি তার উত্তর পার্শ্বে। একটি গেট কাশ্মীরী পুলিশ ও অপরটি ইণ্ডিয়ান আর্মিরা ব্যবহার করে।

পোষ্টের উত্তরে এলাহীবাগ মহল্লা ও আনছার ঝিল। এখান থেকে উত্তর দিকের সড়কটি সামনে গিয়ে দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। এর একটির নাম নওসাহারা রোড যা আলমগিরী হয়ে ডাউন টাউনের দিকে চলে গেছে। এই মোড়ের আলমগিরীতে ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের একটি শক্তিশালী পোষ্ট রয়েছে। অপর শাখার নাম আলীজান রোড। যা গাড়াই মহল্লার পাশ দিয়ে চলে গেছে।

ছুরাহ ক্যাম্পের দক্ষিণ পার্শেই বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এই ক্যাম্পের পূর্বে দিক বাদে বাকী তিন দিক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তিন দিকের দেয়ালে কোন দরজা নেই।

প্রতি দিন নিয়মিত রাত সাড়ে দশটায় ভিসনাগ মন্দির থেকে একটা জীপ ও সাজোয়া গাড়ি খাবার নিয়ে ক্যাম্পে ঢোকে। আমরা প্রথমে এই গাড়ি দুটির ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। তার পর পরিস্থিতি বুঝে ক্যাম্পেও হামলা করা হবে।

আঠারোজন সাথীকে বাছাই করা হল। গাড়ি ভিসনাগ মন্দির থেকে বের হয়ে গানাই মহল্লার পাশের ছোট রাস্তায় উঠে মেইন রোডে আসে। আমরা ছোট রাস্তার মুখে মাইন স্থাপন করে সাথীদের পার্শবর্তি মোর্চায় অপেক্ষা করতে বলি। রাস্তার এক পাশে মোর্চায় রকেট লাঞ্চার ও অপর পার্শ্বে ক্লাসিনকভ ও এল এম জি নিয়ে সাথীরা অপেক্ষা করতে থাকে।

যদি গাড়ি মাইনে ধ্বংস না হয় কিংবা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রকেট লাঞ্চার থেকে তার উপর রকেট নিক্ষেপ করা হবে। যদি কোন সৈন্য নেমে পালাবার চেষ্টা করে, তাকে ক্লাসিনকভের ব্রাশ মেরে ঝাঝরা করে দেয়া হবে। আমরা মোর্চায় বসে শিকারের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। রাত বারোটায়ও গাড়ির কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। অগত্যা সাথীদের ডেকে জমা করে মাইন তুলে সরাসরি পোষ্টের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ক্যাম্পে রকেট দাগার জন্য সুবিধাজনক স্থান মাত্র দু'টি। আমরা প্রথমে দক্ষিণ দিক যেয়ে বিদ্যুত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পাশদিয়ে হামলা করার চেষ্টা করি। কিন্তু সমস্যা হল, যদি গোলা নিশানা ভ্রষ্ট হয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোন খামের সাথে আটকে যায় তবে সমগ্র শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ রচনায় এই অসুবিধা দেখা দেয়ায় আমরা ঘুড়ে মেইন রোডে এসে দেওয়াল থেকে মাত্র ষাট মিটার দূরে দাড়িয়ে রকেট নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি নেই। ইতিপূর্বে ছুরাহ পোষ্টে মুজাহিদরা অনেক বার হামলা করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় দেড়শতাধিক রকেটও এর ওপর বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই হামলাগুলি হয়েছে অনেক দূর থেকে যার ফলে রকেট হামলায় পোষ্টের তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। রকেট নিক্ষেপ করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। বাকী সাথীরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে ক্লাসিনকভ ও এল এম, জি নিয়ে একশত মিটার দূরে পজিশন নিয়ে বসে যায়।

সাবই মিলে আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে অবশেষে একটি রকেট পোষ্টের দিকে ছুড়ে দিলাম। ক্যাম্পের একটি জানালা দিয়ে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছিল। এই কামরায় একজন অফিসার ঘুমাত। আমার রকেটটি সোজা জানালায় আঘাত হানে। প্রচণ্ড আওয়াজে রকেটটি বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে ঐ কামরা থেকে ধুয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখা গেল। রকেটের ছোট ছোট টুকরা অন্যান্য কক্ষে ছড়িয়ে পড়ায় আরও কয়েকটি কক্ষে আগুন লেগে যায়। যদিও রকেটের সামান্য একটি গোলা মাত্র ভিতরে আঘাত হেনে ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তাতে ক্যাম্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রকেট ফায়ারের পর পাঁচ মিনিট পর্যন্ত চারিদিক ছিল নিরর নিস্তব্ধ। এর পর ওই দিকে আরও একটি রকেট ছুড়ে দিলাম। এবারের রকেটটি ছাদে আঘাত হানে এবং ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় রকেটটি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সাথীরা তাদের ক্লাসিনকভ ও এল এম জি দ্বারা অবিরামভাবে গুলি চালায়।

আমাদের ফায়ারের শব্দ শুনে ইনিষ্টিটিউট ও অন্যান্য পোষ্টের সৈন্যরা ফায়ার করতে থাকে। আমরা তাদের রেঞ্জের বাইর থাকায় আমাদের কেউ হতাহত হয়নি। কিন্তু ছুরার পোষ্ট থেকে কেউ একটি গোলাও নিক্ষেপ করল না। আমাদের আক্রমণের ফলে তারা ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা পাল্টা আক্রমণের সাহস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। এর পর আমরা একটি মাইন মেইন রোডে স্থাপন করে পাশের মরিচায় অপেক্ষা করতে থাকি। ধারণা করেছিলাম, আক্রমণের পর ছুরাহ ক্যাম্পের দিকে চারিদিক থেকে গাড়ী আসতে থাকবে। কিন্তু আধা ঘন্টা অপেক্ষার পরও এদিকে কোন গাড়ী আসতে না দেখে মাইন তুলে নিয়ে যাই। এই হামলায় কতজন দুশমন হতাহত হয়েছে তা আমরা সঠিক ভাবে জানতে পারিনি।

কাশ্মীরের নিয়ম হল কোন গ্রুপের হামলা করার পর তার বিবরণ নিজ নামে পত্রিকা অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেয়া। আমরা হামলার পর কোন পত্রিকা অফিসে খবর দেই নি। উপরন্তু আমরা এলাকা বাসীকে বলে এসেছি তারা যেন আমাদের

(২৯পৃঃ দেখুন)

মরণজয়ী মুজাহিদ

মল্লিক আহমাদ সরওয়ার

একদিন আলী সবার সাথে ঘরে বসে নাস্তা করছিল। এমন সময় তারা জঙ্গী বিমানের শব্দ শুনতে পায়। খানা রেখে নিরাপদ মরিচায় পৌছার পূর্বেই তারা বোমা নিক্ষেপের আওয়াজ শুনতে পায়। সাথে সাথে বিকট শব্দে সেটি বিস্ফোরিত হয়।

বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় তাদের ঘরের ওপরে। মুহূর্তের মধ্যে তাদের ঘরখানা ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়। তারমা ও ফুফু ঘরের মধ্যে ছিলো। তারা আত্মরক্ষার সুযোগ পেলেন না। উভয়ে বোমা বিস্ফোরণে ক্ষত বিক্ষত হয়ে তৎক্ষণাৎ দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যান। তার পিতাও মারত্মকভাবে আহত হন। আলী সামান্য যখমী হয়। রক্ত ঝড়া বাহু তুলে প্রতিশোধের স্পৃহায় প্রজ্জলিত আলীর পিতা তাকে কাছে ডেকে বলে, বেটা। তুমি অনেক বার আমার কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছ আমি তোমাকে অনুমতি দেইনি, এখন সময় হয়েছে আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। তুমি খলীলকে সঙ্গে নিয়ে এক্ষুণি বেড়িয়ে পড়।

আলী তার পিতার যখম থেকে অস্বাভাবিকভাবে রক্ত ঝড়তে দেখে মমতার সুরে বল্লো, "আব্বা! আপনি মারাত্মক আহত। আপনাকে এভাবে রেখে কিভাবে যাব?" আলীর আব্বা বল্লেন, "আলী! তুমি চিন্তা কর না। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে তোমাদের সাথে মিলিত হব—ইনশাআল্লাহ্। সময় খুব কম। বিমান হামলা করে ওরা গ্রাম ধ্বংস করছে। এর পরই ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ী এসে গ্রাম ঘিরে ফেলবে। আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের মুকাবিলা করব। যদি মরতেই হয় তবে লড়াইয়ের ময়দানেই মৃত্যুকে আলিংগন করব। কিন্তু তুমি এখনও ছোট, তোমাদের ভবিষ্যত বহু বিস্তৃত। দেশের আযাদীর জন্য লড়তে হবে তোমাদেরই। তোমাদের বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। যদি দুশমন তোমাকে ধরে ফেলে তবে জিন্দা ছেড়ে দিবে বলে মনে করি না। অতএব তুমি আমার কথা শুন, এক্ষুনি এখান থেকে বেড়িয়ে পড়। আর প্রধান পথ ধরে হাটবে না। ইতিমধ্যে সেখানে দুশমনের ট্যাঙ্ক এসে গেছে। পিছনের পাহাড়ী পথ দিয়ে বেরুবে। বারুদের খেলনা ও বারুদের মাইন দেখে পথ চলবে। খলীলকেও তোমার সাথে নিয়ে যাও। ভালভাবে ওর দেখা শুনা করও। ওর যেন কোন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

বিদায়ের বেলা আলীর আব্বা তাকে একটি থলে হাতে দিয়ে বল্লেন, বেটা। এর মধ্যে কিছু টাকা আছে। যা আমি জিহাদে খরচ করার জন্য জমিয়েছি। তুমি এগুলি নিয়ে যাও। প্রয়োজনের সময় এর দ্বারা উপকার হবে। আলীর আববা আলীর কপালে চুমু দিয়ে অসীয়ত করে বল্লেন, সবকিছুর বিনিময়ে ইসলামের পতাকা সর্বদা সমুন্নত রাখবে। তোমাদের গাফলতির জন্য আল্লাহ্র নিকট যেন আমাকে লজ্জিত হতে না হয়। আমি দুয়া করি যেন সকল আফগান নওজোয়ানের আফগানের ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বদা রক্ষার লড়াইয়ে শরীক হওয়ার ভাগ্য হয়। আমাদের জন্য ভেবনা। আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে শত্রুর মুকাবেলা করব।" পিতার ক্ষত স্থান সে রুমাল দিয়ে বেঁধে দেয়। শহীদ মা ও ফুফুকে একবার দেখে চৌখে অশ্রু ও হৃদয়ে প্রতিশোধের স্ফুলিংগ নিয়ে সব মায়া পিছনে ফেলে বাড়ীর পিছন দিক থেকে পাহাড়ের দিকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে কদম কদম অগ্রসর হয়। আড়ালে আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে তারা পাহাড়ের চুড়ায় পৌছে। সেখানে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে তারা গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে বিমানের আকস্মিক আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন বিপদের আশংকা নেই। বোমা হামলায় সমগ্র গ্রাম ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অনেক নারী ও শিশু গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে হিযরত করে চলে আসে। কিছু সময় পরে দুশমনের সাঝোয়া বহর গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো গ্রামকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর তারা গ্রামের উপর লাগাতার তোপের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। তাদের চৌখের সামনে ঘটতে থাকে এই নারকীয় কাণ্ড। ক্রমাগত গোলা বর্ষণের পর তাদের মনে হল যেন গ্রামের একটি প্রাণিও আর বেঁচে নেই। এই বর্বরদের মুকাবেলা করার মত একটি প্রাণীও বুঝি বেঁচে নেই। এবার তারা ট্যাঙ্ক ও সাঝোয়া যান থেকে নেমে ক্লাসিনকভ হাতে গ্রুপে গ্রুপে গ্রামে প্রবেশ করে। হঠাৎ তাদের সামনের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসতে শুরু হয়। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই দুশমনের কয়েক ডজন সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রুশ সৈন্যরা এবার সতর্ক হয়ে পিছনে এসে পুনরায় তোপের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। এভাবে আরও এক ঘন্টা চলার পর ক্লাসিনকভ দ্বারা সামনের দিকে গুলি করতে করতে তারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে।

আলীর কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। না হয় এখান থেকে অতি সহজে বেশ কিছু দুশমনকে হত্যা করা তার জন্য বেশ সহজ ছিলো। সে আফসোস করতে লাগলো, হায় যদি একটা অস্ত্র তার কাছে থাকতো। যখনই

দুশমনের লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখতে সে আনন্দে তকবীর ধ্বনি দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়। ফলে দুশমনের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী ভিতরে ঢুকে পাইকারী ভাবে সকল শ্রেণীর লোককে বন্দী করে। আলী করুণ চোঁখে অসহয়ের মত সব দেখতে থাকে। রুশীরা গ্রামের পুরুষ–মহিলা ও শিশুদের এক মাঠে জড়ো করে ব্রাশ ফায়ারে সকলকে শহীদ করে। এরপর তারা পুরো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসব দেখে আলীর হৃদয় ব্যাথায় কুকড়ে উঠে। খলীল এসব দেখে মানসিক যন্ত্রণায় আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী ভাবতে থাকে, অবশ্যই তার আব্বা বেঁচে নেই। নিশ্চয়ই শহীদদের কাতারে সামিল হয়েছেন তিনি। সে অশ্রু সিক্ত নয়নে উঠে দাড়িয়ে খলীলকে নিয়ে পাহাড়ের অপর দিকে চলে যায়। তারা দু'জন দিন ভর হেটে সন্ধ্যায় পাহাড়ের এক গুহায় শুয়ে পড়ে। উভয়ই ছিল ভীষণ ভীত। এত কম বয়সে এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য কখনও তারা কল্পনাও করেনি। উপরন্তু অজানা পথের এই লম্বা সফর— ভাবছে, কোথায় গিয়ে দাড়াবে। মঞ্জিলও দুশমনদের ঘাটি চেনে না, না জানে তাদের সহযোগীরা কোথায় আছে। সারা দিন পথ চলে ক্লান্ত হওয়ায় শোয়ার সাথে সাথে চোখে গভীর ঘুম নেমে আসে। ঘুমের ঘোরে সারা রাত আলী ভয়ঙ্কর আজে বাজে স্বপ্ন দেখেছে। সকালে উঠে আবার হাটতে থাকে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা মেপে মেপে দেখে শুনে চলতে থাকে। কোথাও মানুষের শব্দ পেলে পথ বদল করে নেয়। হতে পারে ওরা দুশমনদের লোক। অচেনা দেশে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

পথের পাশে একটি যায়গায় ঝর্ণা দেখতে পেয়ে তারা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। হাতের পুটলি থেকে রুটি বের করে খেয়ে নেয় এবং প্রাণভরে পান করে স্বচ্ছ ঝর্ণার নির্মল পাণীয়। খলীল ক্লান্ত হয়ে পড়লে আলী তাকে কাঁধে তুলে নেয়। দুশমনের কোন বিমানের আওয়াজ পেলেই ওরা ঝোপ ঝাড়ে কিংবা পাথরের আড়ালে লুকায় থাকে। এভাবে একাধারে তিন দিন সফর করার পর তারা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পায়ে ফোঁসকা উঠে। চলার গতি ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে। সামান্য যে কয়টি রুটি তারা এনেছিলো তাও শেষ হয়ে গেছে। খলীল ক্ষুধায় কাতরাতে থাকে। বার বার আলীকে বলে "ভাইজান ভীষণ ক্ষুদা পেয়েছে আর হাটতে পারছি না।" আলী তাকে এই বলে সান্তনা দেয় যে, সামান্য চললেই সামনে খাবার পাওয়া যাবে। আলীও ক্রমশ দুর্বলতা অনুভব করছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলতে থাকে। চলারশক্তি নেই তবুও সামনে অগ্রসর হতে হবে—চলতে হবে, তাই চলছে।

আব–হাওয়া খুবই উষ্ণ। হঠাৎ পশ্চিম আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে যায়। বিদ্যুতের চমক ও গর্জনে পাহাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠে। প্রচণ্ড বেগে বায়ু বইছে। এসব দেখে খলীল ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে। আলী তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রচণ্ড বেগে বেয়ে আসা হাওয়ার মোকাবেলা করে মোটেই এগুতে পারছিল না। এমন সময় আকাশ ভেঙে শীলা বৃষ্টি শুরু হয়। শীলা বৃষ্টি থেকে গা আড়াল করার মত কোন আশ্রয় না পেয়ে খলীলকে শীলা থেকে বাঁচাতে আলী নিজের চাদর তার মাথায় বেঁধে দেয়। শীলা গুলো আকার বেশ বড় হওয়ায় আলীর খালি মাথায় আঘাত লেগে প্রচণ্ড ব্যাথার সৃষ্টি করে। সামনে একটি ছোট ঝোপ দেখে তারা তার নিচে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ঝড় ও শীলা থেমে গেলেও বৃষ্টি থামার নাম নেই। প্রথমে প্রচণ্ড গরমে অস্থির ছিল। এবার শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। সন্ধ্যায় বৃষ্টি থেমে গেলেও পাহাড় থেকে বর্ষার পানি নালায় নেমে ঢল বইতে থাকে। পানির স্রোতের সো সো আওয়াজ দূর থেকেও শুনা যায়। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়েও যাওয়া সম্ভব নয়। খলীলের গা বেশ গরম হয়েছে। ক্রমেই জ্বরের তেজ বাড়তে থাকে। খলীল জ্বর ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়তে থাকে। আলী খলীলের বেহাল অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে শান্তনা দিয়ে বল্লো, তুমি এখানে থাক আমি সাতার কেটে ওপারে যেয়ে দেখি খাওয়ার জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা। তুমি বেশী অস্থির হয়ো না। আল্লাহ্ তার অসহায় বান্দাদের জন্য কোন সুব্যবস্থা করবেনই। কিন্তু খলীল কোনক্রমেই একা থাকতে রাজী নয়। আলী নিরাশ হয়ে খোদার কাছে দোয়া করতে থাকেঃ হে পরম করুণাময় আল্লাহ! নালার পানি শুকিয়ে দাও। যেন আমরা ওপারে যেতে পারি। আমাদেরকে বন্ধুদের কাছে পৌছিয়ে দাও।" অসহায় মানুষের প্রার্থনা আল্লাত দ্রুত কবুল করেন।

এমন সময় আলী কারও পায়ে হাটার শব্দ শুনতে পায়। শত্রুর আশংকায় প্রথমে তার শরীর শিউরে উঠে। খলীলের অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরক্ষণেই সে সিদ্ধান্ত নেয়, শত্রু হোক মিত্র হোক এই লোকদের সাথে সে মিলিত হবেই। জীবন মরণের প্রশ্নে প্রয়োজনে শত্রুরও সাহায্য নিতে হয়। তাই এরা যদি শত্রুও হয় নিজের উদ্দেশ্য গোপন রেখে সে তাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাবে।

হাটার শব্দ অনুসরণ করে আলী শব্দ করে তাদেরকে ডাকতে থাকে। কারও ডাকার শব্দ শুনে সাতজন সশস্ত্র যুবক দাড়িয়ে যায়। আলী নিসংকোচে তাদের নিকট তার অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে। অবশেষে সে জানতে পারে, এরা সবাই মুজাহিদ। তারা নিকটবর্তী এক পোষ্টে হামলা করার জন্যে রওয়ানা হয়েছে। খলীলের অবস্থা দেখে কমাণ্ডার ছয়জন সাথী নিয়ে হামলার জন্য চলে যায়। বাকী একজনকে এদের সাথে রেখে যায়। মুজাহিদদের কাছে হয়েছে খাওয়ার জন্য সামান্য গুড় ছিল। তা তারা খলীলকে খেতে দিল। গুড় খেয়ে খলীল সামান্য সুস্থতা

অনুভব করে। নালার পানি কমলে মুজাহিদ যুবকটি তাদেরকে নিয়ে নালা পার হয়ে মারকাজের দিকে চলতে থাকে। খলীলের পক্ষে হাটা সম্ভব ছিল না বলে তাকে কাঁধে করে নিতে হয়েছে। কয়েক ঘন্টা চলার পর তারা মুজাহিদদের একটি চোট মারকাজে পৌঁছে।

এই মারকাজ কায়েম করা হয়েছে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে। পূর্বে এতে জংলী জানোয়ার বাস করতো। মুজাহিদরা তা সাফ করে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। মুজাহিদরা তাদেরকে অবশিষ্ট কয়টি রুটি খেতে দেয় আর গরম চা তৈরি করে পান করায়। এক মুজাহিদের কাছে জ্বরের টেবলেট ছিল তা খলীলকে খাইয়ে দেয়া হয়। তারা শুয়েই গভীর নিদ্রায় ভেংগে পড়ে। সকালে খলীলের জ্বর ছেড়ে যায়। মুজাহিদরা নাস্তা করতে বসতেই রাতের আক্রমনকারী গ্রুপ ফিরে আসে। কমাণ্ডার প্রথমেই আলী ও খলীলের খবর নেয় এর পর গত রাতের অপারেশনের (আকস্মিক হামলার) বিবরণ দেয়। দুশমনের বিশজনেরও বেশী সৈন্য হতাহত হয়। কয়েকটি গাড়ী বিধ্বস্ত হয়। বেশ কিছু রুশী অস্ত্র তাদের হাতে এসেছে। কমাণ্ডার সেগুলি আলী ও খলীলকে দেখায়। এরপর অস্ত্রগুলি মারকাজের অস্ত্রাগারে জমা করা হয়। তিন দিন পর্যন্ত আলী ও খলীল এ মারকাজে থাকে। এর পর কমাণ্ডার তাদেরকে ওই প্রদেশের কেন্দ্রীয় মারকাজে পাঠিয়ে দেয়। মুজাহিদদের চীফ কমাণ্ডার আলী ও খলীলের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি আলীকে বলেন, দেখ বেটা! আফগানিস্তানের সর্বত্র আজ জুলুম ও নির্যাতন চলছে। কোথাও বারুদের খেলনা, কোথাও বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে রুশীরা মুসলমানদের হত্যা করছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মুজাহিদদেরই বিজয়ী করবেন।

আলী বল্লো, দুশমনদের কাছে বিমান, ট্যাঙ্ক এবং অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আছে। খালী হাতে মুজাহিদরা এর মোকাবেলা কিভাবে করবে? আলীর প্রশ্নের জওয়াবে কমাণ্ডার বল্লেন, দুশমন যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন আল্লাহ তাদের থেকে বহুগুণ বেশী শক্তির মালিক। তুমি জঙ্গে বদরের ইতিহাস দেখ। মুসলমানদের কাছে সামান্যই হাতিয়ার ছিল। আর তা নিয়ে তিনগুণ শক্তিশালী কাফেরদের ওপর আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ আমরাও অতি শিঘ্রই দেশকে রুশদের থেকে আজাদ করব এবং আফগানিস্তানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াব।

অল্প দিনের মধ্যেই আলী মুজাহিদদের পরিবেশের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেয়। এক দিন কমাণ্ডারের কাছে যেয়ে বলে, "আমাকে অস্ত্র দিন আমিও দুশমনের সাথে লড়াই করব।"

কমাণ্ডার তাকে বল্লেন, "এখনও তুমি ছোট, আমি তোমাকে ও খলীলকে পাকিস্তান পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। সেখানে লেখাপড়া শেষ করে ফিরে এসে তোমরা জিহাদে শরীক হবে। কিন্তু আলী নাছোড় বান্দা। সে বলতে লাগলো, আমি এত ছোট নই যে বন্দুক উঠাতে পারবো না। আর এখন আমার অস্ত্র চালানোর শিক্ষা নেয়া বেশী প্রয়োজন। যা পাকিস্তানে নয় বরং এখানেই হাসিল করা সহজ ও সম্ভব। কমাণ্ডার তাকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তে অনড়। অবশেষে কমাণ্ডার আলীর প্রস্তাব মেনে নেন। তবে শর্ত দিলেন, ছয় মাস পরও কোন লড়াইয়ে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বরং ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে সে মারকাজের সকলের খেদমত করবে। ঝর্ণা থেকে মুজাহিদদের জন্য পানি আনবে। জ্বালানী সংগ্রহ করবে এবং যখন যে কাজের প্রয়োজন তা করবে। এরপর তাকে অস্ত্র দেওয়া হবে এবং লড়াইয়ে যাওয়ার অনুমতি পাবে। আলী সানন্দে এ প্রস্তাব মেনে নেয়। খলীলকে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হয়। যাওয়ার সময় খলীল খুব বেশী কান্নাকাটি করে। আলী তাকে অনেক বুঝায় এবং শান্তনা দিয়ে বলে, পাকিস্তান এসে সে মাঝে মাঝে তার সাথে দেখা করবে। ছয় মাস পর আলীর ট্রেনিং সমাপ্ত হলে চীফ কমাণ্ডার তার হাতে অস্ত্র তুলে দেন। আলী অত্যন্ত খুশী হয়। সে এবার দুশমনের ওপর হামলা করার জন্য নিজে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে।

আলী রাইফেল ও অন্যান্য ছোট অস্ত্র চালাতে সক্ষম হওয়ায় চীফ কমাণ্ডার তাকে ছোট ছোট হামলায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন। এসব অভিযানে আলী অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দেয় এবং প্রমাণ করে যে, সে অন্যান্য মুজাহিদদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। আলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে রকেট লাঞ্চার ও বিমান বিধ্বংসী তোপ পরিচালনা শিখে নেয়। এর পর সব ধরণের আক্রমণের সময় সবার আগে তাকেই ডাকা হয়। [চলবে]

কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল

(২৬পৃঃ পর)

সংগঠনের নাম প্রকাশ না করে। আমরা আমাদের তৎপরতার সস্তা প্রচার চাই না। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কর্মদ্বারা সফল করে দেখাতে চাই। সংবাদিকরা আক্রমণকারীদের সনাক্ত করতে না পেরে নিজেরাই মহল্লায় এসে খোঁজ নিতে শুরু করে। পরদিন আসসফা, আফতার, শ্রীনগর টাইম্‌স ও চটান প্রভৃতি পত্রিকায় হেড লাইনে আমাদের হামলার খবর প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার হেড লাইনে লিখিত হয় "হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী"-এর আক্রমণে ছুরাহ পুলিশ ষ্টেশন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত।" অন্য পত্রিকায় শিরোনাম করা হয় "হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী ও সৈন্যদের মধ্যে শ্রীনগরে এক দীর্ঘ লড়াই" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরদিন ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী মহল্লায় হানা দিয়ে বেশ কয়েকজন নিরীহ লোককে গ্রেফতার করে। মহল্লার মধ্য থেকে হামলা না করে মেইন রোড থেকে আক্রমণ করায় তাদেরকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়। [চলবে]

(আল-ইরশাদের সৌজন্যে)

অনুবাদঃ মনজুর হাসান

ঈদ এসেছে ঈদ

কাজী হায়াত মাহমুদ

আজকে সবার ঘরে ঘরে,
ঈদ এসেছে ঈদ।
ভোর না হতে তাইতো সবার,
ভেঙ্গে গেছে নিঁদ।
ছোট বড় সবার মাঝেই
ঈদ এলো ভাই ঈদ।
তাইতো আজি খুশীর জোয়ার,
বইছে চারিদিক।
ঈদ এসেছে শহর-গাঁয়ে,
ঈদ এসেছে ঈদ।
সবার ঘরেই তৈরি আজ
খাবার বহু বিধ।
হিংসা ভোলার বাণী নিয়ে,
ঈদ এসেছে ভাই,
সবার সাথে মিলেই তো,
ঈদের মজা পাই।
ঈদের নামায পড়বে সবে,
ঈদগাহে এক সাথে।
সবার তরে খোদার রহম,
চাইবো মোনাজাতে।

ফী ছাবিলিল্লাহ

এমামুদ্দীন মোঃ ত্বহা

আমি মুজাহিদ ফী ছাবিলিল্লাহ,
সব কিছু দিয়েছি, দিব লিল্লাহ্।
যায় যদি যাক, সব কিছু যাক,
ইসলামের মান উন্নত থাক।

শত্রুতা, ভালোবাসা মোর ফিল্লাহ
সম্মান ইজ্জত কিছু চাই না,
লাঞ্ছনা, দুঃখ, ব্যথা কিছু মানিনা।
ইসলামের রাজ দাও হে আল্লাহ্।

নাম কাম চাই না, দল চাই না,
নেতা হতে চাইনা, মান চাইনা।

ইসলামী শাসন দাও হে আল্লাহ্
জান যদি নিতে হয় নিয়ে যাও।
মান যদি দিতে হয় দিব তাও,
মূল ধন ঈমান রাখ আল্লাহ্।

দুখু মিয়ার স্বপ্ন

মোঃ মুহাম্মদ ইউসুফ

মাগো আমি কবি হব লেখব কবিতা,
দেশের মানুষ গরীব কেন বলব খুলে তা,
ভেদের কথা খুলে বলি তাই তো আমি কবি,
বেনিয়াদের কালো হাতে বন্দী হল রবি।

দুখু মিয়ার দুঃখ সবই রইল চাপা পড়ে,
বাংলা বাসীর ভাগ্যে সুখ বইবে কোন কালে?
অবশেষে তালা লাগাই দুখু মিয়ার মুখে
সুযোগ বুঝে কষছে ছুরি বাংলাবাসীর বুকে।

নইলে দেখ পূর্বে মোদের স্বর্ণের ইতিহাস,
সত্য কথা বলছি আমি ভাগ্যের পরিহাস।
স্বর্গীয় দেশ শেষ করিল বর্গীয় ঐ সেনা
নৌকা যোগে লুটে নিলো এই দেশের সব সোনা।

সেই অর্থে কায়িম হয় ইংলণ্ডেরী ব্যাংক,
ভারত বাসীর ভাগ্যে আসে জোর জুলুমের ট্যাঙ্ক।
দাসত্বেরী জিন্দেগীতো দালালদেরী পেশা,
সে সময়ে ছিল অনেক ইং-বিলাতী ঘেসা।

শাসকেরা ছিলো সব তাদের অনুকূলে,
আমরা ছিলাম বিদ্রোহী ও তাদের প্রতিকূলে।
বিলাত-বীণার সুর ধরিল চেলা চামুন্ডেরা,
আদর্শ ভ্রষ্ট ও নীতিহারা নিম্ন জাতির যারা।

খোদার কৃপায় অবশেষে স্বাধীন হল দেশ,
আশা ছিল ভালো হবে দেশের পরিবেশ।
কিন্তু কিছু রয়ে গেল লর্ড ক্লাইভের ছেলে,
অদ্যাবধি ঘুরছে তারা কালো দু'হাত মেলে।

আরও একবার স্বাধীন হলাম লক্ষ প্রাণ দিয়ে,
ভাগ্য চাকার উল্টো গতি ঘুরছে আরো জোরে।
দুখু মিয়ার স্বপ্ন ছিল স্বাধীন দেশের বুকে,
ঐশী সুরে বাজবে বীণা সব মানুষের মুখে।

কিন্তু মোদের ভাগ্য আজো যেমন ছিল তেমন,
বিভোর কেন সুপ্ত ঘুমে হতে হবে চেতন।
বেনিয়ারা ঘুরছে আজো দেশ ও দেশান্তরে,
সাদা চামড়ার পিশাচ গুলোর নাই যে সরম মোটে।

বীর কেশরী বেরলভী ও তিতুর রাংগা খুনে,
রংগীন সেই লাল পতাকা কোথায় লুকালে।
বালাকোটের রক্ত ঝড়া রণ বাধ্য শুনে
শীঘ্র কেন জোশ আসেনা মুসলমানের খুনে?

বসন্তের কোকিল গুলো বেদন সুরে গান করিবে,
দুঃখ শুধু নাইত কেউ যিনি তাহার তান ধরিবে।
দুখি মায়ের দুখু মিয়ার সুখ হবে না কেন?
তাঁর বিলাপের ভেদ বুঝিতে কান দেবনা কেন?

প্রশ্নোত্তর

• মোঃ তসলিমুল আলম,
পোঃ ফকিরহাট,
ভায়াঃ নাজিরহাট,
চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ *আমরা শুনে থাকি, আবার একদিন বিশ্বময় ইসলামী শাসন কায়িম হবে। যিনি এর নেতৃত্বে থাকবেন তাঁর নাম হবে ইমাম মাহদী (আলাইহির রেযওয়ান)। আমার জিজ্ঞাসা হলো ইমাম মাহীদ কি কোন পিতা-মাতার সন্তান হবেন না আল্লাহ্ তাকে সরাসরি আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। যদি তিনি কোন পিতা-মাতার সন্তান হন তবে তাঁদের নাম কি হবে। ইমাম মাহদী কত বছর বয়সে দাজ্জালের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবেন। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন, কোথায় ইমাম রূপে প্রকাশিত হবেন এবং কত বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করবেন?*

উত্তরঃ হাঁ ইমাম মাহদী (আলাইহির রেযওয়ান) পিতা-মাতার সন্তান হবেন। স্বাভাবিক নিয়মে মায়ের উদর থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন।

সহীহ হাদীসের আলোকে সকল আহলে হক এ কথার ওপর একমত যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নসলে তাঁর জন্ম হবে। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ের বংশ হবে সায়্যেদ। তাঁর নাম হবে মুহাম্মাদ, পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম হবে আমেনা।

অনেক ক্ষেত্রে পুত্র যেরূপ পিতার চরিত্রে শুশোভিত হয় ইমাম মাহদী অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র বৈশিষ্টে শুশোভিত হবেন। তবে তিনি নবী হবেন না। তাঁর ওপর অহী নাযিল হবে না।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্নিত এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, পবিত্র মদীনায় তাঁর জন্ম হবে এবং সেখানেই তিনি লালিত-পালিত হবেন। মক্কা মুকাররামায় তাঁর নিকট লোকেরা খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করবে। কোন এক পর্যায়ে তিনি হিজরাত করে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যাবেন।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যখন তাঁর হাতে মুসলিম-জনতা বাইয়াত গ্রহণ করবে তখন তাঁর বয়স হবে চল্লিশ বছর। তাঁর খেলাফতের সপ্তম বছর কানা দাজ্জালের প্রাদুর্ভাবব ঘটবে। তাঁর সাথে কাফির বাতিল শক্তির রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে থাকবে। এক পর্যায়ে মাহদী তাঁর সৈন্য বাহিনীসহ দাজ্জালের নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনীর বেষ্ঠনির মধ্যে বন্দীহয়ে পড়বেন। এই মুহূর্তে ঠিক ফজরের নামাযের সময় দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। ওই ওয়াক্তের ফজরের নামায তিনি মাহদী (আলাইহির রেযওয়ান)-এর ইমামতীতে আদায় করবেন। নামায শেষ করে তারা দজ্জালের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হবেন। দজ্জালও শক্ত পায়ে তাদের মুকাবিলা করতে উদ্যাত হবে। পরিশেষে "বাবে লুদ" নামক স্থানে তাঁর তীক্ষ্ণ বর্শার আঘাতে দাজ্জালের প্রাণ নাশ ঘটবে। এর পর থেকে তাদের হাতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের ঘাঁটি ও কেন্দ্রগুলোর একটি একটি করে পতন ঘটতে থাকবে। তাদের নেতৃত্বে তখন আরেকবার বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ঘটবে। উনপঞ্চাশ বছর বয়সে ইমাম মাহদী ইন্তেকাল করবেন।

• আহমাদ নূরুল্লাহ,
দরজায়ে ফযিলাত ফিল হাদীস,
জামেয়া হুসাইনিয়া গহরপুর,
বালাগঞ্জ, সিলেট।

প্রশ্নঃ *হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর শহীদ হযরত মাওলানা এরশাদ আহমাদ (রাহঃ)-এর বিস্তারিত জীবনী জানতেচাই।*

উত্তরঃ আফগান জিহাদে বহিরাগত হিসাবে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে শহীদ এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) ছিলেন একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সাধারণ মুজাহিদই ছিলেন না। একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন বটে।

বর্বর রুশরা ১৯৭৯ইং আফগানিস্তানে হানা দিয়ে নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে যেরূপ হত্যা ও অমানবিক অত্যাচারসহ ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল তা দেখে এরশাদ আহমাদ (রাহঃ)-এর ঈমান দীপ্ত কোমল হৃদয় দারুনভাবে আহত হয়। তিনি ভীরুদের মত করুণার চোখে তাকিয়ে সামান্য দুঃখ প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে না ভেবে হানাদার রুশদের মুকাবিলায় অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮০ থেকে তিনি আফগান মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করতে থাকেন।

এই তৎপরতাকে আরও ব্যাপক ও সুসংহত করার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর জন্ম হয়। আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণকারী পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী মুজাহিদদের এটি একটা মযবূত প্লাট ফরম। শহীদ আব্দুর রহমান ফারূকী (রাহঃ) ছিলেন এই সংগঠনেরই চীফ কমাণ্ডার।

এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) ১৯৫১ সনের ৫ই জুন পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নেন স্থানীয় স্কুল এর জামেয়া কামেয়মিয়া ফয়সালাবাদে দু' বছর। দারুল উলুম পিপলস কলোনী ফয়সালাবাদে কিছুদিন এবং কুন্দিয়া শরীফ হযরত মাওলানা কান মুহাম্মাদ সাহেবের মাদ্রাসায় দু'বছর পড়াশুনা করেন। জামেয়া রশিদিয়া সাহিওয়াল-এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহনের সিদ্ধান্তে আরও দুবছর কাটান। অতপর পাকিস্তানে বিখ্যাত কওমী প্রতিষ্ঠান জামেয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া আল্লামা বিননুরী

টাউন করাচীতে ১৯৭৯ সনে দাওরা হাদীস শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই শিক্ষা বছরেই তিনি ১৯৮০-এ ১৮ই ফেব্রুয়ারী আফগান জিহাদে চলে যান। পরবর্তী বছর জামেয়া রশিদিয়া সাহওয়াল থেকে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার চূড়ান্ত পর্ব দাওরা হাদীছে পরীক্ষা দিযে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

আফগানিস্তানের বহু অপারেশনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। একাধিক জিহাদে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ সফরটি ছিলো ১৪০৫ হিজরীর ৬ই শাওয়াল।

আমীর এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) সহ ৪৫ জন মুজাহিদ বিশিষ্ট এই কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা ঈদ মুহাম্মদ। একটি ট্রাকটর ট্রলিতে করে প্রয়োজনীয় রসদসহ তারা পাকতিয়া ও গজনির মধ্যদিয়ে শিরানার পথে রওয়ানা হন। পথে মাগরীবের নামায আদায় করে আবার পথ চলা শুরু হয়। কিন্তু শত্রু বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিদৃষ্ট স্থানে পৌছা খুব কঠিন বিধায় তারা রাত দশটা পর্যন্ত একস্থানে অবস্থান নেয়। পথে কোন অসুবিধা থাকলে তা তৎক্ষণাৎ অবহিত করার জন্য স্থানে স্থানে পূর্ব থেকে লোক নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু তাদের পৌছতে দেরী হওয়ায় পাহারা তুলে সবাই চলে যায়।

শত্রু বাহিনীর গুপ্তচর তাদের সংবাদ জেনে তা রুশবাহিনীকে অবহিত করলে তৎক্ষণাৎ মুজাহিদ বাহিনীর ওপর সাড়াশি আক্রমণ করার জন্য তারা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখে। মুজাহিদ কাফেলা নির্দৃষ্ট স্থানে পৌছে দেখে, তাদের একজন পাহারাদারও নেই। তাঁদের পৌছতে দেরী হওয়ায় তারা সকলে চলে গেছে। এই সুযোগে শত্রুবাহিনী তাদের অবস্থান স্থলের বিশ মিটার দূরে এসে অবস্থান নেয়। শত্রু যে এত কাছে মুজাহিদরা তা অনুমান করতে পারেনি। আনুমানিক রাত সাড়ে দশটার সময় মুজাহিদদের গাড়ীর ওপর শত্রুর একটি মোবা এসে বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে গারীর ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। এর পরই শুরু হয় শত্রুপক্ষের বৃষ্টির মত গোলা নিক্ষেপের পালা। এভাবে পনের মিনিট চলে। এই সময়ের মধ্যে গুলি বোমা ও গ্রেনেট এত পরিমাণে নিক্ষেপ করা হয়েছে যে, একজন মুজাহিদও বেঁচে থাকার কথা নয়। উপরন্ত গাড়ীতে থাকাও সম্ভব নয়। সমস্ত গাড়ীতে আগুন জ্বলছে। এই আলো চিহ্নিত করে ওরা ওদের আক্রনের ধারা আরও তীব্র করে।

তবে মুজাহিদরা দমিত না হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য পজিশন নেয় এবং শত্রুর ওপর গুলি করতে থাকে। এক পর্যায়ে শত্রুর একটি গুলি আমীর এরশাদ আহমাদ (রাহঃ)-এর ঠিকবুকের মাঝখানে এসেবিদ্ধ হয়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই অবস্থায়ও তিনি সাথীদের দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করার জন্য উৎসাহিত করছিলেন। তিনিও তার বন্দুক দিয়ে ওদের প্রতি গুরি ছুড়ছিলেন। বার বার তাকবীর ধ্বীন তুলে মুজাহিদদের মনে শক্তি সঞ্চয় করছিলেণ। এদিকে তার শরীর থেকে রক্ত ঝরে জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। জীহাদের ময়দানে তিনি চীর নিদ্রায় ঢলে পড়েন।

শহীদ (রাহঃ) প্রায়ই বলতেন, আমি যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হই তাহলে আমার লাশ বাড়ী নিয়ে আসবে না। বরং সম্ভব হলে ময়দানে আরও সামনে অগ্রসর হয়ে আমাকে দাফন করবে। তাঁর এই অসিয়ত ও ওই এলাকার লোকদের অনুরোধে পাকতিয়ার শারানা শহরের নিকটে 'কোট ওয়াল' স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এই জিহাদে বাংলাদেশী মুজাহিদ হাফেজ কামরুজ্জামানও শাহাদাত বরণ করেন। এঁদের সকলকে একই স্থানে দাফনকরা হয়েছে। এলাকার লোকেরা শহীদদের এই কবরস্থানকে 'বাগে জান্নাত' বলে অবিহিত করে। তাদের শাহাদাতের তারিখ হলো ২৫ জুন ১৯৮৫ সাল।

এই জিহাদে বাইশ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। আর শত্রু সৈন্য নিহত হয় পঁয়ত্রিশ জন।

• মোঃ আব্দুল আজিজ ভুঞা,
দ্বাদশ শ্রেণী,
জামিয়া হুসাইনিয়া গওহরপুর,
সিলেট।

প্রশ্নঃ *রূপসী জহুরার কাহিনী ও পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হারুত-মারূত সম্পর্কিত ঘটনাটি জানাবেন কি?*

উত্তরঃ ইয়াহুদী জাতি তাদের দ্বীন ও কিতাব ছেড়ে এক পর্যায়ে জাদুবিদ্যার ভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকম জাদু চর্চার ব্যাপকতা দেখা দেয়।

দু'টি পক্ষ থেকে তারা জাদু শিক্ষা করে। এক, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সময় জ্বিন ও মানুষ একই সমাজে বাস করত। এই সূত্রে খারাপ প্রবৃত্তির জ্বিন-শয়তান মানুষকে এই বলে জাদু শিখাত যে, তারা সুলায়মান (আঃ) থেকে এই বিদ্যা শিখেছে এবং তিনি জাদু বলেই ক্ষমতায় টিকে আছে।

জ্বিন শয়তানদের এই মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ স্বরূপ পবিত্র কুরআন বলা হয়েছেঃ "এই সব কুফুরী, সুলায়মানের নয়।" এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সুলায়মান (আঃ) যে জাদু বলে শাসন করেছেন শয়তানের সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অপপ্রচার বই নয়।

দুই, হারুত মারূতের মাধ্যমেঃ বাবল শহরে এই ফেরেশতাদ্বয় মানুষের সুরতে বাস করতেন। তারা জাদু বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে কেউ তাদের নিকট জাদু শিখতে আসলে স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলতেন, 'জাদু শিখলে ঈমান থাকে না।' তারপওর কেউ পিড়া পিড়ি করলে অগত্যা তারা জাদু শিখাতে বাধ্য হতেন।

এই ফেরেশতাদ্বয়কে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, এদের সাথে রুপসী জহুরা নামক এক মহিলাকে সম্পর্কিত করে যে কাহিনী প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তার সত্যতার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

নিষ্পাপ ফেরেশতাদের সম্পর্কে এইরূপ কোন কথা ও মিথ্যা অপবাদ প্রদান চরম অন্যায় বই কি? এ সব ঘটনা ইয়াহুদী ও মুনাফিক সাবা গোষ্ঠীর সৃষ্টি। এসব ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে সকলের

সতর্কতা কামনা করি। যারা এ পর্যন্ত বিভিন্ন বই পুস্তকে ও ওয়াজ নসীহতে হারূত মারূতের ঘটনার সাতে কথিত জহুরা বিবির ঘটনা রসাল ভংগিতে লিখেছেন বা বলেছেন তাদের সে প্রচেষ্টারও প্রতিবাদ জানাই।

• মুছাঃ মিমি,
দশম শ্রেণী,
শাহবাজপুর স্কুল, যশোর।

প্রশ্নঃ *যদি কোন মহিলা কোর্ট তালাক করে প্রথম স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই ঘরে যদি সন্তান হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এই সন্তানের হুকুম কি?*

উত্তরঃ মহিলার কোর্ট তালাক যদি শরীয়াত সম্মত হয় তাহলে তার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণে বাঁধা কোথায় এবং দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে যদি সন্তান হয় তবে এই সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কই?

আপনার প্রশ্নে এই বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, মহিলা তার প্রথম স্বামীকে কোন কারণে কোর্ট তালাক দিয়েছে। তাই আপনার প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধান্ত প্রকাশে অপারগ থাকায় দুঃখিত। প্রশ্ন পরিষ্কার করে লিখলে আগামীতে সিদ্ধান্ত মুলক উত্তর দিতে চেষ্টা করব। কেননা কোর্ট তালাক যে সর্বক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য এমন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদেরকেও স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার শরীয়তে দেয়া হয়েছে।

মিজানুররহমান,
গ্রামঃ মাছুয়া খালী, পোঃ নাগের পাড়া,
জেলাঃ শরীয়তপুর।

প্রশ্নঃ *(ক) পুরুষের জন্য হাতে ও হাতের আংগুলে মেহদী ব্যবহার করা জায়িয আছে কি?*

(খ) মেয়েদের সতর মেয়েদের সামনে ও মুহরিম পুরুষের সামনে কতটুকু জানতে চাই।

উত্তরঃ (ক) ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায় এইরূপ কোন প্রকারের প্রসাধনী ব্যবহারই পুরুষের জন্য জায়িয নয়। মেহদী এর আওতায় পড়ায় এ ব্যাপারেও ওই একই হুকুম বর্তায়।

(খ) মেয়ে লোকের বেলায় মেয়েলোকের সতর ততটুকু এক পুরুষের বেলায় অন্য পুরুষের যতটুকু। অর্থাৎ নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত।

মুহরিম পুরুষের সামনে চেহারা, মাথা, সিনা, হাতের কব্জি ও পায়ের নলাসহ নিম্নাংশ সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাদের সামনে শরীরের এই সব স্থান খোলা রাখা যায়।

• সিকদার আবুল বাশার,
প্রযত্নেঃ আঃ মালেক সিকদার,
থানা শিক্ষা অফিস,
তেরখাদা, খুলনা।

প্রশ্নঃ *জনৈক লোক দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রোগে ভুগছে। বহু চিকিৎসার পরও সুস্থ্য হচ্ছে না। এখন ধৈর্য হারা হয়ে বলছে যে, সে আর আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে না এবং সে এখন কোন ইবাদাত করেও না। এ লোকটির ব্যাপারে সুপরামর্শ চাই।*

উত্তরঃ ওই লোকটির কথায় মনে হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট ইবাদাতের মোহতাজ। আল্লাহ্ কেন তার রোগ আরোগ্য করছেন না এটাই তার অভিযোগ এবং নামায রোযা পালন না করার কারণ। আসলে এসব স্পষ্ট শয়তানের ওয়াস ওয়াসা। লোকটির এখনই তওবা করা উচিত। এই অবস্থায় যদি মারা যায় তাহলে পরিণতি কত ভয়াবহ হবে তা তার ভেবেদেখা উচিত। যে লোকটি রোগের সামান্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ্‌র ওপর গোস্বা হয়ে নামায রোযা চেড়ে দিয়েছে সে ব্যক্তির ভাবা উচিত, নামায রোযা পালন নাকরার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির সময় সে কার ওপর কোন কারণে গোস্বা হবে? সময় থাকতে সতর্ক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আর তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান যারা আল্লাহ্‌র সব হুকুম আহকাম পুংখানুপুংখ পালন করে ও পরকালের ভয়ে কাতর থাকে এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয়। তাই পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মর্মার্থে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তাকেই হেদায়াত দেন তিনি যার কল্যাণ চান।"

মোহাম্মাদ ইয়াসিন,
জামেয়া ইসলামিয়া, লালমাটিয়া,
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ *ওহাবী ও সুন্নী কাদেরকে বলে এবং আমাদের দেশে কোন ওহাবী আছে কি?*

উত্তরঃ ওহাবীকে সুন্নী থেকে আলাদা কোন মতবাদ বলে মনে করার কারণ নেই। যাদেরকে ওহাবী বলা হয় তারা আসলেই সুন্নী। মূলত ওহাবী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া একটা অর্থহীন অপবাদ। অষ্টাদশ শতকে আরবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী নামক একজন সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। গোর-পূজাসহ নানা প্রকার গোমরাহি ও বেদায়াতের মধ্যে পতিত মুসলমানদের প্রকৃত হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন।

কিন্তু তিনি ইংরেজদের ঘোর শত্রু থাকার কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে সৈয়দ আহমাদ শহীদ কর্তৃক পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনকেও ইংরেজরা ওই একই কারণে ওহাবী নামে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ওরা এক শ্রেণীর ধামাধরা আলিম ও পীর পর্যন্ত নিয়োজিত করেছিলো। ইংরেজরা বহু আগে এদেশ থেকে চলে গেছে। সৈয়দ আহমাদ শহীদ ও আব্দুল ওহাব নজদীর আন্দোলনের যথার্থতা আজকের শিক্ষিত মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পরছেন, কিন্তু একশ্রেণীর লোক কোন কিছু না বুঝে চিন্তা না করে স্বাধীনচেতা, সংস্কারবাদী, হক্কানী আলিমগণকে এখনও ওহাবী নামে অভিহিত করছে। যা দুঃখজনক বই কি?

ওহাবী যেহেতু আলাদা কোন মতবাদ নয় তাই কেউ নিজেকে ওহাবী বলে দাবী করে না। তাই এদেশেও কোন ওহাবী নেই।

আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদায় যারা বিশ্বাসী তারাই সুন্নী। এদেশের এক প্রকার বেদায়াতী আছে যারা নিজেদেরকে সুন্নী বলে দাবী করে। আসলে তারা হয়ত ভণ্ড না হয় চরম গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত।

• মোঃ নূরুল ইসলাম,
শান্তিনগর, ঢাকা।

প্রশ্নঃ *কুরআন শরীফ সর্ব প্রথম কোন দেশে কত সনে কার উদ্যোগে ছাপা হয়। বিস্তারিত জানতে চাই।*

উত্তরঃ মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরআন শরীফ হাতে লেখা হতো। শুধুমাত্র কুরআন লেখার লক্ষ্যে মুসলমানরা আরবী ক্যালিওগ্রাফী বা লিপি সৌকর্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কৃত হওয়ার পর জার্মানীর হামবুর্গ শহরে জার্মানীদের দ্বারা ১০১১ সনে সর্ব প্রথম কুরআন শরীফ মুদ্রিত হয় বলে জানা যায়। মুদ্রিত সেই কুরআন শরীফের একখানা কপি মিসরের দারুল কুতুবে এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। মুসলমানগণ কর্তৃক সর্ব প্রথম রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃঃ মাওলায়ে ওসমান নামক এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুদ্রণ করেন। একই সনে তেহরান থেকেও লিথু মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কুরআন শরীফের আরও একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

আব্দুল মাবুদ,
শাহজাদপুর, বাড্ডা,
গুলশান, ঢাকা।

প্রশ্নঃ *ফরজ পর্দা পালন করলে নারী জাতিকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে এবং নর ও নারীর সমান অধিকার থাকবে না। এরূপ মন্তব্যের জবাব কি?*

উত্তরঃ পর্দা ফরয হওয়ার পর থেকে চৌদ্দশ বছর অতীত হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনদ্বীনদার মুসলিম নারী পর্দা পালন করে আঙ্গিক দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে এমন কথা এখনও কেউ বলতে পারেনি। সামাজিক দিক দিয়ে কর্মক্ষেত্রে বা বিদ্যার ক্ষেত্রে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন এমন খবরও আমরা পাইনি। তারা পুরুষের সমান অধিকার পাননি এমন ঘটনাও ইসলামী সমাজে দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং দেখা গেছে, 'হেজাব' বা পর্দার বিধান দিয়ে ইসলাম নারী জাতিকে প্রকৃত মর্যাদার আসন দান করেছে। পুরুষের অধীন করে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করেনি। পর্দাহীনা অবস্থায় নারীরা পদে পদে যে লাঞ্ছনার শিকার হতেন এবং এখনো হচ্ছেন, তা থেকে মুক্তি পেয়ে মুসলিম নারীরা মর্যাদা ও অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করেছেন। লজ্জা নিবারণ ও শীত গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই সভ্য দুনিয়ার মানুষেরা পোশাক পরিধান করে। এখন যদি গভীর জঙ্গল থেকে কোন একদল উলঙ্গ মানুষ লোকালয়ে এসে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করা শুরু করে যে, মানুষ যেহেতু পোষাক পরিচ্ছদহীন অবস্থায় ভূমিষ্ট হয় তাই পোশাকের বেড়াজালে মানব দেহ আবৃত করা মানুষের স্বভাবগত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা শোশাকের বাধ্যবাধকতা ত্যাগ করে উলঙ্গ হতে পারে তারাই প্রকৃত স্বাধীন। তবে তাদের বক্তব্যকে কি যথার্থ বলে মেনে নিতে হবে? তেমনি ইসলামের পর্দা অর্থ নারী জাতিকে অবরুদ্ধ করা নয়; বরং পর পুরুষের স্বভাবজাত লুব্ধ দৃষ্টির প্রকোপ থেকে নিজেদের আকর্ষণীয়তাকে আড়াল করে রাখতে যত্নবান হওয়া। সুতরাং লুঙ্গি জামা ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া যদি পুরুষের পক্ষে স্বাধীনতা বলে বিবেচিত না হয়। তবে পর্দা রক্ষা করার মতো পোশাক পরে বেড় হওয়া নারী জাতির জন্য অবরোধ বলে বিবেচিত হওয়াও বিবেকের দাবী নয়।

• মুহাম্মাদ ইলিয়াস,
কাউখালী, পিরোজপুর।

প্রশ্নঃ *হযতর আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশতের মধ্যে যে নিষিদ্ধ গাছটির ফল খেয়েছিলেন ওই গাছটির নাম কি? কোন কোন বই কিতাবে ওই গাছটির নাম 'অমর বৃক্ষ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে কি তাই?*

উত্তরঃ ওই গাছটির নামকি তা কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। তবে শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচনা করেছিলো যে, এই গাছটি 'অমর বৃক্ষ'। এর ফল ভক্ষণ করলে আপনারা চিরঞ্জীব হবেন এবং অনন্তকালের জন্য বেহেশতে থাকার অধিকার লাভ করবেন। এক পর্যায়ে তারা শয়তানের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ ভুলে ওই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে। আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করার অপরাধে সেই সময় আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)কে বেহেশত থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

গতসংখ্যায় এইরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিলো যে, "সেই গাছটির নাম ছিলো অমর বৃক্ষ।" এ অংশ এভাবে পড়তে হবে যে, শয়তান তাদেরকে এই গাছটির নাম অমর বৃক্ষ বলে প্রলুব্ধ করেছিলো।

আপনার কপিটি নিয়মিত এই ঠিকানা থেকে খুঁজে নিন

সিলেট শহরের সকল "জাগো মুজাহিদ" পাঠক ও গ্রাহকগণ সরাসরি এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

এজেন্টঃ **মাসিক জাগো মুজাহিদ**

সৈয়দ কাওসার আলী
পুস্তিকা পেপার এণ্ড কনফেকশনারী,
৭ নং সফর মার্কেট, চাঁদনী ঘাট,
সিলেট।

নবীন মুজাহিদদের পাতা

পরিচালকের চিঠি

আস্‌সালামু আলাইকুম

প্রিয় নবীন বন্ধুরা!

অশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তবে আমার মনে হয় তোমরা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছ। তোমরা পূর্বের তুলনায় অনেকটা অমনোযোগী বলে মনে হয়। না হয় গত সংখ্যায় কারও উত্তর সঠিক না হওয়ার কারণ কি? প্রশ্নগুলো কি খুব কঠিন ছিলো? ধারণা ছিলো একটু চেষ্টা করলে তোমরা এর সঠিক উত্তর খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু পারনি। বলো, এ লজ্জা ঢাকবে কি দিয়ে?

তোমাদেরকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা। তাই তোমাদেরকে পড়াশুনায় আরও আগ্রহী হতে হবে। প্রত্যেক সদস্য প্রতি সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর পাঠাবে। নতুবা তোমাদের সদস্য হওয়ার স্বার্থকতা কোথায়? যদি তোমাদের কেবল নাম ঠিকানা ছাপানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করব–এর মধ্যে যারা উত্তর পাঠাতে অলসতা করবে তাদের ব্যাপারে নতুনভাবে চিন্তা–ভাবনা করব। আশা করি তোমরা আমাদেরকে কঠিন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে না। এ ব্যাপারে আগামী সংখ্যায় আবার লিখব। তোমাদের লেখা–পড়ায় ভলো করা ও সুখী জীবন কামনায়

পরিচালক ভাইয়া

গত সংখ্যার উত্তর কারও সঠিক না হওয়ায় পূর্বের প্রশ্ন রেখে দেয়া হলো।

বলতে পারো?

১। বাংলা সনের উদ্ভাবক কে?

২। জাহিলিয়াত যুগে আরবের লোকেরা পবিত্র কা'বাকে ঘিরে বর্ষশুরুর যে বর্ণাঢ্য মেলা অনুষ্ঠান করতো সেই মেলাটি কি নামে প্রসিদ্ধ?

৩। আল হামরা প্রসাদ কোন শহরে অবস্থিত?

৪। শেখ সাদী কত সনে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। কাদেরকে আশরায়ে মুবাশশারা বলা হয়, তাদের নাম কি?

নবীন মুজাহিদের সদস্য কুপন

নাম ---------- বয়স ----------

পিতা ---------- শ্রেণী ----------

পূর্ণ ঠিকানা ----------

আমার বয়স ১৮ বছরের কম। আমি এই পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। নবীন মুজাহিদদের কাফেলায় সদস্য হতে আগ্রহী। কুরআনের আলোকে জীবন গড়তে অংগীকারাবদ্ধ। এই পত্রিকার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একজন করে পাঠক সংগ্রহ করব।

স্বাক্ষর

এই কুপনটি কেটে পূরণ করে দুই টাকার অব্যবহৃত ডাক টিকেট সহ আমাদের ঠিকানায় পাঠালে আমরা তাকে নবীন মুজাহিদদের সদস্য করে নিবে।

তোমরা সবাই নবীন মুজাহিদ

১৪৩। কাজী আবদুল্লাহ্ আল-মামুন,
পিতাঃ কাজী আবুল ওফা মোঃ নূরে ছাফা,
জার্মানী হোষ্টেল, রুম নং-২২,
পি,ডি,বি, কলোণী, আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ
কেন্দ্র, আশুগঞ্জ। বি, বাড়িয়া।

১৪৪। মোঃ জামাল উদ্দিন,
পিতাঃ মাওঃ মোঃ আবু ইউসুফ,
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া কাসেমুল
উলুম জামিল মাদ্রাসা,
বগুড়া।

১৪৫। মোঃ আমিনুর রহমান,
পিতাঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা,
গ্রামঃ দক্ষিণ চাঁদপুর,
পোঃ সীমাখালী, বাঘারপাড়া,
যশোর।

১৪৬। মুহিববুর রহমান খান (তাকরীম)
পিতাঃ মাওঃ আতাউর রহমান খান
নূর মঞ্জিল,
জামিয়া ভবন,
কিশোরগঞ্জ।

১৪৭। মোঃ এনামুল হক (নাছির),
পিতাঃ ডি, এম, আবু নাছির
মুহাঃ আনোয়ারুল হক,
গ্রামঃ লোহারমপুর,
সিলেট।

১৪৮। হাফেজ হাফিজুর রহমান,
পিতাঃ মোঃ মুনছুর রহমান প্রমানিক,
গ্রামঃ যশীপুর, (বালুপাড়া),
পোঃ বাগবাড়ী,
বগুড়া।

১৪৯। মোঃ জামাল উদ্দীন (মাসুম),
পিতাঃ বজলুর রহমান,
সাংঃ সাহাগ্রাম,
পোঃ হরিপুর, বাজার,
ছাগল নাইয়া, ফেনী।

১৫০। মোঃ ঃমুজাহিদুল ইসলাম (শামীম),
পিতাঃ ডঃ আব্দুল আউয়াল,
মেসার্স জনতা হেমিও ফার্মেসী,
পোঃ ভোরা জগৎপুর, হরিশ্চর
চৌরাস্তা, লাকসাম, কুমিল্লা।

১৫১। মোঃ তারেক মাহমুদ,
পিতাঃ ক্বারী মোহাম্মাদ হোসাইন,
গ্রামঃ আশুতিয়া পূর্ববাড়ী,
পোঃ কাজুলিয়া, কোটালীপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫২। মোসাঃ বুশরা মাহমুদ নাবিলা,
পিতাঃ মুফতী মোঃ আঃ আহাদ,
গ্রামঃ আশুতিয়া, পোঃ কাজুলিয়া,
কোটালীপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৩। মোঃ সেলিম,
পিতাঃ মোঃ নীল মিয়া,
গ্রাম খোশকান্দি,
পোঃ দাড়িয়ার চর বাজার,
বানছারামপুর,বি-বাড়িয়া।

১৫৪। কাজী মোঃ আবু তাহের,
পিতাঃ কাজী মোঃ মান্নান (মাছুম),
গ্রাম ও পোঃ মাঝবাড়ী,
কোটালী পাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৫। মোঃ মুফিজুর রহমান (রুমী),
পিতাঃ মাষ্টার মোঃ লিয়াকত আলী খান,
গ্রামঃ রংকুরা (খা বাড়ী),
পোঃ মাঝবাড়ী, কোটালী পাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৬। মোঃ মোস্তফা কামাল (রুবেল),
পিতাঃ আবু খালেদ খান,
জামাল মঞ্জিল,
কুয়ার পাড়,
সিলেট।

১৫৭। হাফেজ মুহাম্মাদ রিজওয়ানুল বারী,
মুহাম্মাদ ফজলুল করিম,
গ্রামঃ মুছাপুর,
পোঃ পণ্ডিতের হাট,
সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

১৫৮। হাঃ আশিকুর রহমান (মিঠু),
পিতা এম, এ, আমিনুদ্দীন,
গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা,
টুঙ্গিপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৫৯। মোঃ মিজানুর রহমান জাফরী,
পিতাঃ মাওঃ আঃ ওয়াছেল,
গ্রামঃ পাতাছড়া, পোঃ কলাবাড়ী,
উপজেলাঃ রামগড়,
জেলাঃ খাগড়াছড়ী।

১৬০। মোঃ আকরামুজ্জামান,
পিতাঃ মোঃ আব্দুস সাত্তার মিয়া,
গোয়াল চামট আশরাফুল উলুম
মাদ্রাসা,
পোঃ শ্রী অংগন, ফরিদপুর।

১৬১। হাফেজ মুহাঃ আব্দুল জলীল,
পিতাঃ আবু তালেব বিশ্বাস,
সাং বড় ঘিঘাটি,
পোঃ বিনিপনগর, থানাঃ কালিগঞ্জ,
ঝিনাইদহ।

১৬২। মোঃ হুমায়ূন কবির (শাহজাহান),
পিতাঃ মোঃ নাজিম উদ্দীন,
গ্রামঃ হেলেনচা,
ডাকঘর, ভাদুরিয়া,
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১৬৩। এইচ, এম, এ, বাশার,
পিতাঃ মোঃ আঃ করিম মোল্লা,
গ্রাম ও পোঃ রায়গ্রাম,
লোহাগড়া,
নড়াইল।

১৬৪। মোঃ তাহছিন মাহমুদ বেলাল,
পিতাঃ মোঃ বাহাউদ্দীন,
গ্রামঃ আশুতিয়া পূর্ব বাড়ী,
পোঃ কাকুলিয়া, কোটালিপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

১৬৫। মোঃ মনসুরুল হক জেহাদী,
পিতাঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব,
গ্রাম, পোয়াপাড়া,
পোঃ কলমপতি,
কাউখালী, রাঙ্গামাটি।

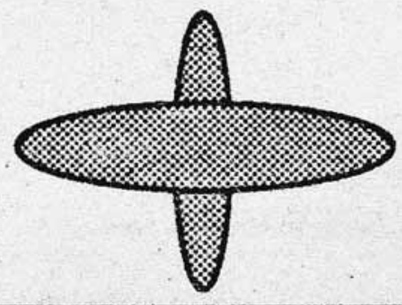

একজন কিশোরী ও একটি ক্লাশিনকভ

উম্মে নাঈম

রুশ সেনাদের শক্তিশালী, অত্যাধুনিক ও বিশালকার ট্যাংক বহর উঁচু নিচু অসম পথ অতিক্রম করে বিজয়ী কাফেলার মত উন্নত শিরে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। চলন্ত ট্যাংকগুলোর গম্ভির আওয়াজ ও সেনাদের মূহমূহু জয়ধ্বনি পাহাড়গুলোকে কাঁপিয়ে তুলেছে। ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ীর ওপরে কাস্তে হাতুড়ে আঁকা লাল পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে।

তাদের এতটা নির্ভিক হওয়ার কারণ, তারা গোয়েন্দা সংস্থা 'খাদের' মাধ্যমে আগেই অবগত হয়েছে যে, এ এলাকাটি জনমানব শূন্য বিরাণ। কোন মনুষ্য এখানে নেই। এর কিছুদিন পূর্বে লাল পতাকা উড়িয়ে এখানে যারা এসেছিলো তাদের দৈত্তের মত ট্যাংকগুলো স্পন্দিত জীবনের কল কাকলীতে মুখর এই জনপদটিকে মাটির সাথে গুড়িয়ে দিয়ে ধ্বংসের জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে। উপরন্তু রাস্তা ঘাটের জীর্ণ দশা, বিধ্বস্ত ঘর বাড়ী ও ভুতুরে পরিবেশ এরই স্বাক্ষ্যর বহন করছে।

অতএব যেখানে একটি শত্রুও অবশিষ্ট নেই। প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার কোন আশংকাই যেখানে নেই, সে স্থান দিয়ে নির্ভিক চিত্তে চলতে বাঁধা কোথায়? কে ঠেকায় তাদের অগ্রযাত্রা?

তারা উত্তাল তরঙ্গের মত মাতাল হয়ে উৎকণ্ঠাহীনভাবে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। ভাবখানা এমন, তাদের অগ্রাযাত্রা কেউ রুখতে পারবে না।

কিন্তু জনমানব শূন্য মৌনতার নিরবতা ভেদ করে হঠাৎ সামনের পাহাড় থেকে বুলেটের আওয়াজ ভেসে এলো। তারা থমকে দাড়ালো, কোন পাহাড় থেকে বুলেট গুলো আসছে তা ঠাওর করতে পারছে না। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। সবই অপ্রত্যাশিত, এমন একটা পরিস্থিতির জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এ' যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।'

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছট ফট করছে তরতাজা ক'টি প্রাণ। একটি বুলেটও ফাঁকা যায়নি। প্রতিটি বুলেট অব্যার্থ নিশানা হয়ে এক একটি বুক এফোড় ওফোড় করে অনতি দূরে লুকিয়ে গেলো। তাদের সাথে কেউ তামাশা করছে, না তারা মহাবিপদের সম্মুখীন তা বুঝে উঠতে পারছে না—সকলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে বোকা রুশ বাহিনী কোন দিক নির্ণয় না করে বৃষ্টির মত গোলা বর্ষণ শুরু করলো। কেউ কেউ তড়ি ঘড়ি পজিশন নিল ঝোঁপ ঝাড়ের-আড়ালে আবডালে। বিরাট ট্যাংক বাহিনী তাদের কাপুরুষতা ঢাকার জন্য ভারি ভারি গোলার আঘাতে সামনের পাহাড়গুলোর উপর চরম প্রতিশোধ নিচ্ছে। তাদের নিক্ষেপিত ভারি ভারি সেলগুলো চারিদেকে জাহান্নামের দাহ সৃষ্টি করছে। বিরাণ জনপদটার যে দুচারটি ঘর বাড়ী ক্লান্তভাবে ধ্বংসের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে ছিল তাও এবার জ্বলে ও ভেংগে ছার খার হয়ে গেল। তাদের বিষাক্ত সেলগুলো যেখানেই বিস্ফোরিত হয় সেখানেই সৃষ্টি হয় কুন্ডুলি পাকানো আগুনের বিরাট বিরাট শিখা।

পাহাড়গুলো থেকে কোন বুলেট আর আসছে না। রুশ বাহিনী ভাবছে, হয় তো এতক্ষণে আক্রমণকারীরা নরকের দ্বারে গিয়ে ঠেকেছে। তাদের শরীরের সবটুকু রক্ত এতক্ষণে এদেশের তৃষ্ণিত রঙ্গা মাটিরা চুষে চুষে খেয়ে ফেলেছে। যেমনভাবে রক্ত পান করে জংগলের নেকড়েরা।

এমনি সময় তাদের ভাবনার পর্দা ছেঁদ করে ডান দিকের পাহাড় থেকে এক ঝাক গুলি এসে তাদেরকে আলিঙ্গন করলো। আলিঙ্গনাবদ্ধ বুলেটগুলোর যন্ত্রণায় কয়েকজন নওজোয়ান পাষাণ পাহাড়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল।

থেমে থেমে চোরা গোপ্তা আক্রমণ রুশ বাহিনীকে অস্তির করে তুলছে। দোর্দন্ড রুশবাহিনী এবার চরম অসহায়ত্ব বোধ করছে। কত দিক থেকে কত শতজনে আক্রমণ করছে তা এখনো বুঝতে পারছে না। তাই পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু পালাবে কোথায়, মনে হচ্ছে যেন তিন দিকের পাহাড়গুলোর চূড়ায় চূড়ায় অসংখ্য মুজাহিদ মর্টার তাক করে বসে আছে। পালাবার পথও রুদ্ধ। বেঁচে থাকার একমাত্র পথ ট্যাংকের গোলাদ্বারা পাহাড় গুলোকে মাটির সাথে মিসিয়ে সামনে ময়দান তৈরী করা। তাই একের পর এক আঘাত, ভারী ভারী অস্ত্রের আঘাত। কিন্তু একটি পাহাড়ও ভাংগছে না। সামনে বাড়তে পারছে না। এদিকে লাশের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রক্তে রঞ্জিত অসংখ্য লাল সৈন্য জনমের মত ঘুমিয়ে গেছে।

নিজ সেনাদের লাশের বহর দেখে ভীত সন্ত্রস্ত কমান্ডার একটু সাহস সঞ্চয় করে নির্দেশ দিল, সামনে বাড়ো! এমনি মূহুর্তে ওদিকের পাহাড় থেকে একঝাক বুলেট এসে অগ্রগামী বাহিনীর বুকগুলো ঝাঝরা করে দিল। কমাণ্ডার মৃত্যু অনিবার্য ভেবে সৈন্যদেরকে সামনে বাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চিৎকার দিয়ে বললো, সামনে বাড়ো!

ঠিক এই মূহুর্তে গর্জে উঠলো আর একটি পাহাড়। লুটিয়ে পড়লো কয়েক ডজন রুশ সেনা। তারা আহ্ উহ্ করছে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তারই কোলে ঢলে পড়ছে। রক্তের বন্যায় চুতর্দিক ভেসে যাচ্ছে। নেপত্যের আক্রমণটা এবার যুৎসই হয়েছে।

সেনাদের অগ্রগামী লাইন ভেঙ্গে গেছে। বাকী যারা বেঁচে আছে তারা হতাশা ও উৎকণ্ঠার গহীন সাগরে হাবু ডুবু খাচ্ছে। লাল পতাকাবাহী তথাকথিত বিপ্লবীরা এবার তাদের রাঙ্গা রক্তে ভেলার মত ভাসছে।

মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যারা তামাশায় মেতে উঠে, মুসলমানদের রক্ত দিয়ে যারা জিঘাংসা চরিতার্থ করে, মুসলমানের রক্ত যাদের কাছে পানির মূল্যও রাখে না, আজ প্রকৃতি তাদেরকে উপহাস করে হাসছে আর বলছে, প্রতিশোধ, এরই নাম যথার্থ প্রতিশোধ।

এখনও ওরা নির্ণয় করতে পারে নি যে, বুলেটগুলো ঠিক কোন দিক থেকে আসছে এবং আক্রমণকারীরা সম্ভাব্য কতজন হতে পারে, আক্রমণের তেজ ধারা তাদেরকে এসব ভাববারই অবকাশ দিচ্ছে না।

তবুও ব্যার্থতা ঢাকার ব্যার্থ কসরত। ট্যাংকগুলোর উদ্দেশ্যহীন অগ্নিবর্ষন। তন্দ্রালু–নিরব পাহাড়িকার গায়ে উপর্যুপরি আঘাত। পাহাড়গুলো থর থর করে কেঁপে উঠছে। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে অবিরাম গোলা বর্ষণ করবে। তবুও ব্যার্থতা ঢাকতে হবে। যেদিক ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা, কামান দাগাও, সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাক। একটি প্রাণীও বেঁচে না থাকুক তাতে এতটুকু দুঃখবোধ জাগবে না। কেননা এদেশে তারা মানবতার ডাকে আসেনি, তারা এসেছে এশিয়ার এই হৃদপিন্ডটাকে দখল করতে—চায় শুধু দখলদারিত্ব। এদেশের ধন–সম্পদ ও জন–সম্পদ বাঁচলো কি মরলো তাদের তো সেদিকে তাকাবার কথা নয়? সোজা কথায় তারা মানুষ চায় না মাটি চায়।

কমাণ্ডার বহু কষ্ট করে নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলো। একটু সামনে আগাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাহসের অভাবে ব্যার্থ হলো। বার বার সামনে আগাবার চেষ্টা করে বারবার ব্যার্থ হলো। অগণিত লাশ তাদের পথ রোধ করে দাড়ায়।

আঘাতের পর আঘাত খেয়ে কমাণ্ডারের হুশ এলো। জীবিত সেনাদেরকে হালকা অস্ত্র নিয়ে পাহাড়ে ওঠার আদেশ করল। আর ট্যাংক বাহিনীকে যে কোন হামলা প্রতিহত করার জন্য হুশিয়ার থাকার পরামর্শ দিল।

গেরিলা সেনারা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে আক্রমণকারীদেরকে কুকুরের মত তেজ অনুভুতি নিয়ে হন্ত দন্ত করে খুঁজতে লাগল। কি আশ্চর্য, কোথাও একটি মানুষের গন্ধ নেই। বদমায়েশরা গেল কোথায়? মাটিতে লীন হয়ে গেছে, না হাওয়ায় উরে গেছে, সবগুলোতো এভাবে বেঁচে যাবার কথা নয়। সহস্র গোলার আঘাতে কমপক্ষে দু'চারটি লাশ পড়ে থাকাই ছিল স্বাভবিক।

প্রতিপক্ষের গোলা থেমে গেছে। অনেক্ষণ যাবৎ কোন বুলেট ইসলামের শত্রুতায় ভরা এই ফেরাউনী বাহিনীর বুকে এসে বিঁধছে না। তাই কুফুরীর কালিমায় লেপা বুকগুলোয় সামান্য সাহসের সঞ্চার হয়েছে। যে হৃদয়গুলো ইসলামের সাথে চির শত্রুতায় চুক্তিবদ্ধ সেই হৃদয়গুলো আবার শত্রুতার দাহতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। চরম প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাগ্রতা নিয়ে তারা আক্রমণকারীদেরকে খুঁজতে পাহাড়গুলো তন্ন তন্ন করে চষে বেড়াচ্ছে। ওদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

হঠাৎ ওরা ধমকে দাড়ালো। মৃত্যুর আশংকায় ওদের হৃদয়গুলো থর থর করে কেঁপে উঠল। ছোট ছোট চদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সামনে রক্তের লাল লাল ছাপ। ওই যে এটা লাশ! ক্রোধে ফেটে পড়লো ওরা। বেয়নেট বের করে প্রাণহীন ঘাতকের বুকের মাঝখানে বসিয়ে দেবার ইচ্ছা করলো। কিন্তু একি, এ যে এক কিশোরী। জনমানবহীন এই জনপদটায় কেন এসে ছিলো কুসুমের মত এই মেয়েটি? ওদের মনের কোনে অজান্তে একটু সহনভূতি জেগে উঠলো।

কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, ন'বছরের ছোট একটি মেয়ে আর তার হাতে একটি ক্লাশিনকভ! সমস্ত শরীর রক্তাক্ত তার। বুকে বুলেটের আঘাত। আশ পাশের কোথাও কোন মুজাহিদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে কি আমরা এতক্ষণ একজন কিশোরীর সাথে মুকাবিলা করেছি? লজ্জা এত লজ্জা লুকাবার জায়গা পৃথিবীতে কোথায়।

অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত বিশাল ট্যাংক বাহিনীকে দীর্ঘ চার ঘন্টা ঠেকিয়ে রেখেছিল একা কিশোরী একটি ক্লাশিনকভ দিয়ে। আর নিশ্চিৎ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে রুশ সেনাদের একাংশকে। বিরাঙ্গণা কিশোরী আফগানী বলেই এমনটা দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে।

এই কিশোরী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় ও মাতা–পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অতৃপ্ত তৃষ্ণায় সেই দিন থেকে পাহাড়ে এসে উঠেছে যেদিন রুশ বাহিনীর পাষাণ হৃদয় সেনারা তার পিতা–মাতা–আত্মীয় স্বজনকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে এবং মাথা গুজার ঠাই প্রিয় ঘরটিকে যে দিন তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কিশোরী অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। কখন আসবে প্রতিশোধ গ্রহণের সুভক্ষণ। যারা আমার পিতা–মাতাকে হত্যা করেছে, যারা আমার মাতা গুজার ঠাই ঘরটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে, যারা আমার ফলের বাগান নষ্ট করেছে, যারা আমার প্রিয় মাতৃভূমি দখল করে নিয়েছে—আমার ক্লাশিনকভটা দিয়ে তাদের একজনকে হলেও আমি হত্যা করব। বদলা আমি নিবই জীবনের বিনিময়ে হলেও।

সুযোগ আসলো। মেয়েটি তার ক্লাশিনকভটা দিয়ে থেমে থেমে তিনদিকের পাহাড় থেকে আক্রমণ রচনা করে বিশাল বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। পিতা মাতা হত্যার প্রতিশোধ সুদে আসলে গ্রহণ করলো। শেষ আকাংখা শাহাদাতের সুধা পান করার সৌভাগ্যও তার ঘটলো। সংযোজিত করলো বীরত্বগাঁথার পাতায়

(৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা

শাইখুল হাদিস মাওঃ আজিজুল হক সাহেবের ঐতিহাসিক মুক্তি লাভ

অবশেষে সত্যের জয় হল, আরো একবার ইসলমের বিজয় হল। বাংলাদেশের মর্দে মুজাহিদ লং মার্চ নেতা শাইখুল হাদিস জনাব মাওঃ আজিজুল হক সাহেরেব কারা-মুক্তি এক ঐতিহাসিক ঘটনার সৃষ্টি করল। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন আর্য ব্রাহ্মণদের বিরোধীতা ও তাদের নাপাক ত ৎপরতার প্রতিবাদ করার কারণে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছিল গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনের সময়। কেননা এই বাংলাদেশে বসে এই মর্দে মুজাহিদ যে হায়দারী হুঙ্কার ছেড়েছিলেন তাতেই ছিল্লীর তখতে তাউসে উপবিষ্ট নরসীমা রাওজীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এরপরও যদি রাওজীর ঢাকা আগমনের পরও এই মর্দে মুজাহিদকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে দেয়া হত তাহলে হয়ত রাওজী যে কোন মুহূর্তে হার্টের ব্রেক ফেল করতেন। সুতরাং রাওজীর চিত্তে শান্তি দেয়ার জন্য সরকার তার শুভাগমনের (!) পূর্বেই জনাব আজিজুল হক সাহেবকে বন্দী করে তার আশংকা দূর করেন।

ভারতের তোয়াজ করতে গিয়ে এদশের মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে কারারুদ্ধ করার গর্হিত তৎপরতা এদেশের মানুষ সুনজরে দেখেনি। তারা তাদের নেতাকে মুক্তির জন্য আর একটা লং মার্চ করার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অবশেষে সরকারের টনক নড়ে। তারা মাওঃ আজিজুল হক সাহেবকে মুক্তি দেয়ার যে কোন একটা ইস্যু খুঁজছিল এবং পেয়েও গেল। মাদ্রাসার ছাত্ররা তাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদের এ কারা যন্ত্রণা সহ্য কতে পারছিল না। তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে কিতাব নিয়ে হাজির হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেটে। তাদের জেল পুলিশের নিকট একটাই দাবীছিল, "হয় আমাদের উস্তাদকে মুক্তি দাও, নতুবা বুখারী শরীফ পড়াও।"

ব্যাস, এতটুকুই যথেষ্ট। বাংলাদেশের ইতিহাসের সকল বেকর্ড ভঙ্গ করে সরকার মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে সাইখুল হাদীস মাওঃ আজিজুল হক সাহেবকে মুক্তি দেয়। যা' ছিল এক অভাবনীয় ঐতিহাকি ঘটনা। সরকারের এ ব্যাপক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আবারো প্রমাণিত হল সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

কাশ্মীরের মুজাহিদদের হাতে একটি থানার পতন

গত ১৪ই মে একে-৪৭ ও ৭৪ এ্যসল্ট রাইফেল সজ্জিত কাশ্মীরী মুজাহিদরা গভীররাতে পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত কাশ্মীরের একটি থানায় হামলা চালিয়ে সেটি দখল করে নেয়। ভিলগাম নামের এই থানায় অভিযানের সময় কোন পক্ষের কেউ হতাহত হয়নি। মুজাহিদরা থানার কল পুলিশকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। পরে তারা ২০টি রাইফেল ও হাজার হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ নিয়ে সটকে পড়ে।

কাশ্মীরী পুলিশরাও অবশেষে স্বাধীনতার দাবী জানালো

ভারতের সেনাবাহিনীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে কাশ্মীরের মুসলমান পুলিশরাও স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়েছে। আধা সামরিক বাহিনীর হেফাজতে একজন মুসলিম পুলিশের মৃত্যুর পর তারা এই দাবীতে সোচ্চার হয়েছে। উক্ত পুলিশকে মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরী পুলিশদের সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। এজন্য তাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় না। সহকর্মীরা মৃত্যুর জন্য দায়ির বিচার চেয়ে কাশ্মীরী পুলিশরা এক ব্যাপক ধর্মঘটে অংশ নেয়। অবশেষে ৬দিন পর কমাণ্ডো সৈন্যদের হস্তক্ষেপে তাদের নিরস্ত্র করা হয় এবং ধর্মঘটের অবসান হয়। এ ঘটনার পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগের দায়ে ৭৯ জন পুলিশকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এর আরও বহুজনকে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। নিরাপত্তা বাহিনীর এ অবিচারের জন্য তারা খুবই ক্ষুব্ধ এবং মুজাহিদদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে স্বাধীনতার স্লোগান তুলে প্রকাশ্যে মিছিল করছে।

সারাজোভোয় পাঁচজন নিহত

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গ্রীসের এথেন্স নগরীতে শান্তি আলোচনা চলাকালিন বসনীয় সার্বদের প্রচণ্ড মর্টার হামলায় পাঁচজন মুসলিম নিহত হয়েছে। বসনীয় সার্বনেতা এই বৈঠকে শান্তি চুক্তিতে সই দেয়ার মাত্র ৫ ঘন্টার ব্যবধানে এই ঘটনা ঘটে। এটা ছিল মুসলমানদের প্রতি সার্বদের শান্তির আধুনিক তোহফা।

বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটল আরেকটি মুসলিম দেশের

বিশ্ব মানচিত্রের বুকে নয়া একটি মুসলিম দেশের অবয়ব ফুটে উঠেছে। ইসলামী ঐতিহ্যে ভরপুর লোহিত সাগরের কোল ঘেঁষে আফ্রিকার শৃঙ্গে জন্ম নিয়েছে নতুন মুসলিম দেশ ইরিত্রিয়ার। ত্রিশটি বছর ধরে সংগ্রামের পর ৬০ হাজা মুজাহিদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নিয়েছে এই দেশের। প্রায় ৪০০ বছর তুর্কী উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার পর এ দেশটি ১৮৬৪ সালে ইতালী দখল করে নেয় এবং এ দখল ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইটালির বিদায় নেয়ার পর জাতিসংঘ দেশটির জনমত উপেক্ষা করে পার্শ্ববর্তী ইথিওপিয়ার ম্যান্ডেটরী শাসনে অর্পন করে। সঙ্গত কারণেই মুসলমানরা তাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলে ইথিওপিয়া একসময় ইরিত্রিয়াকে গ্রাস করে নেয়। ফলে মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলনও তীব্র হয়। দীর্ঘ দিনের আন্দোলন শেষে ১৯৯০ সালে কমুনিষ্ট হাইলে মরিয়ম মেঙ্গেস্তুর বাহিনী ইরিত্রিয়া থেকে বিতাড়িত হয়। মূলত তখনই ইরিত্রিয়া স্বাধীন হয়ে যায়। চলতি মাসে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দেশটির জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে ৯৯%

সমর্থন প্রকাশ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পর বিশ্বের অনেক দেশ তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। স্বীকৃতিদাতাদের মধ্যে ইথিওপিয়াও অন্যতম।

বসনীয় মুসলিম বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

বসনীয়ার মুসলিম বাহিনী দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মোস্তারে আক্রমণকারী ক্রোকবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। ক্রোক বাহিনী গত এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লংঘন করে এই মুসলিম শহরটি দখল করে নেয়ার জন্য মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। উল্লেখ ক্রোট ও মুসলিম বাহিনী সার্বদের বিরুদ্ধে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করলেও সাম্প্রতিক সময়ে বসনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভগাভাগি করে নেয়ার জন্য সার্ব ও ক্রোকদের মধ্যে একটি গোপন সমঝোতা হওয়ার কারণে সে মৈত্রি চুক্তি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এদিকে জাতিসংঘের একতরফা অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার ফলে গোলা বারুদের অভাবে মুসলিম বাহিনী এক প্রকার অসহায় হয়ে পড়েছে। বসনীয় শহর সেব্রেনিয়ার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুসলিম বাহিনীর কাছে ১৫ হাজার অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকলেও এই নিষেধাজ্ঞার কারণে মুসলমানরা গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে না পরায় সম্প্রতি সেব্রেনিকা শহরের পতন ঘটে। একই কারণে জেপা শহরে ও পতন হয়। বসনিয়া কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে বার বার দাবী করছে যে, তাদের দেশের ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে তারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সভ্যতা গর্বী পাশ্চাত্য ও জাতিসংঘ তাদের এ আহবানে অজ্ঞাত কারণে সারা দিচ্ছে না।

আবখাজিয় বাহিনীর হামলায় ৭ জন জর্জীয় সৈন্য নিহত

সম্প্রতি আবখাজিয়ার স্বাধীনতাকামী মুসলিম গেরিলাদের এক হামলায় ৭ জন জর্জীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১৪ জন। সৈন্যরা যখন একজন নিহত সৈন্যের আন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান চালাচ্ছিল তখন গেরিলারা মর্টার হামলা চালালে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ, গত আগস্ট মাসে আবখাজ পার্লামেন্ট জর্জীয়া থেকে আবখাজিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলে জর্জীয়ার সাথে আবখারিয়ার গেরিলা বাহিনীর লড়াইয়ের সূচনা হয় এবং এ পর্যন্ত সহিংসতায় কয়েক হাজার লোক নিহত হয়েছে।

সতেরজন ভারতীয় সৈন্য হত্যার পর শাহাদাত লাভ

শ্রীনগর "হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর" মুজাহিদ মাওলানা দোস্ত আলী ১৭ই রমযান কাশ্মীরের বারামুল্লাহ শহরে ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের সাথে এক কৃতিত্বপূর্ণ অসম লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

কাশ্মীর থেকে হাফেজ আকরাম উল্লাহ্‌র পাঠানো এক বিবরণে জানা যায় মাওলানা দোস্ত আলী (চৌধুরী গিয়াস নামে পরিচিত) বদর দিবসে দুশমনদের ওপর এক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়ে ভারতীয় সৈন্যরা এলাকায় সান্ধ আইন জারি করে। তল্লাশির জন্য বাড়ীর চারদিক ঘিরে ফেলে। সেই সময় মাওলানা দোস্ত আলী ও মোহাম্মাদ সাবের সহ মোট আটজন মুজাহিদ একটি গোপন ব্যাংকারে আশ্রয় নেয়। সৈন্যরা তল্লাশী করে তাদের বের করতে সক্ষম না হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু গুপ্তচর তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে মুজাহিদ থাকার কথা বলে। এর পর সৈন্যরা একটি দেওয়াল ভেঙ্গে ব্যাংকারের সন্ধান পায়। ব্যংকারের বাইর থেকে চারজন মুজাহিদের নাম ধরে ডাকতে থাকে। এরা আল জিহাদ নামক সংগঠনের সদস্য। তারা এই ভেবে বাইরে আসে যে, এতে বাকী চারজন বেঁচে যেতে পারবে। কিন্তু তাদের বের হবার পর অপর দুজনের নাম ডাকতে থকে। তারাও বের হয়ে আত্ম সমার্পণ করে। এর পর গুপ্তচর থেকে সংবাদ নিয়ে সৈন্যরা বাদবাকী দুজন মুজাহিদের নাম ডাকা শুরু করে। দুশমনের হাতে ধরা না দিয়ে লড়াই করে শাহাদাত লাভকে শ্রেয় মনে করে মুজাহিদ দোস্ত আলী ক্লাসিনকভ নিয়ে বাইরে এসে এক ব্রাশে আটজন সৈন্য ঘায়েল করে।

এর পর গেটের বাইরে দাড়ানো আরও দুজন সৈন্যকে হত্যা করে ঘরের তিন তলায় চলে যায়। মুহাম্মদ সাবের তার পরে বের হয়ে ঘরের মধ্যে আহত সৈন্যদের হত্যা করে উপরে চলে আসে। এরা দুজন সাড়ে তিন ঘন্টা পর্যন্ত দুশমনদের মোকাবেলা করে। এর পর গুলি শেষ হলে নিহত সৈনিকদের থেকে ম্যাগাজিন ভর্তি গুলি আনার জন্য দোস্ত আলী ক্রোলিং করে নিচে মেনে আসে। এই সময় দুশমনদের থেকে এক ঝাক গুলি এসে দোস্ত আলীর মাথা ও বুকে বিদ্ধ হয়। প্রাথমিক খবরে ভারতীয় দশজন সৈন্য নিহত ও আঠারোজন আহত হয় বলে জানা যায়। পরে আহতদের মধ্য হতেও এগারো জন হাসপাতালে মারা যায়। অসম সাহসী মুজাহিদ কমাণ্ডার দোস্ত আলী একুশজন সৈন্যকে নিহত ও পাঁচজনকে আহত করে শাহাদাত লাভ করেন।

এই আকস্মিক আক্রমণে সৈন্যরা এত ভীত হয় যে, সুবেদার তাদেরকে শহীদ দোস্ত আলীর অস্ত্র আনতে আদেশ করলে তারা লাশের সামনে যেতে ভয় পায়। একজন সিভিলিয়ানের সাহায্যে তারা তার অস্ত্র তুলে কোনক্রমে নিহত সৈন্যদের লাশ নিয়ে চলে যায়। অপরদিকে মুজাহিদ মুহাম্মদ সাবের সৈন্যরা চলে গেলে নিরাপদে ঘাঁটিতে পৌছে এই সংবাদ জানায়।

গ্রন্থনায়ঃ ফারুক হোসাইন খান

একজন কিশোরী

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

একটি বর্ণালী অধ্যায়। আর ইসলামের শত্রু সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের জানিয়ে দিল, মাযা'য ও মুআ'যের বোনেরা এখনো বেঁচে আছে। এখনও মুসলমানের ঘরে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও তারিক ইবনে যিয়াদের রূহানী মেয়েরা জীবিত আছে। দ্বীনের জন্য জীবনকে উৎসর্গিত করার মত মেয়েদের এখনও অভাব নেই। কেন না এদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনাদের তপ্তলহু। যাদের ইতিহাস গর্বিত ইতিহাস, যাদের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস। যারা পরাধীনতাকে কখনও মেনে নেয় না এবং পরাজয়কে কখনও গ্রহণ করে না।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডাক্স,
নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক

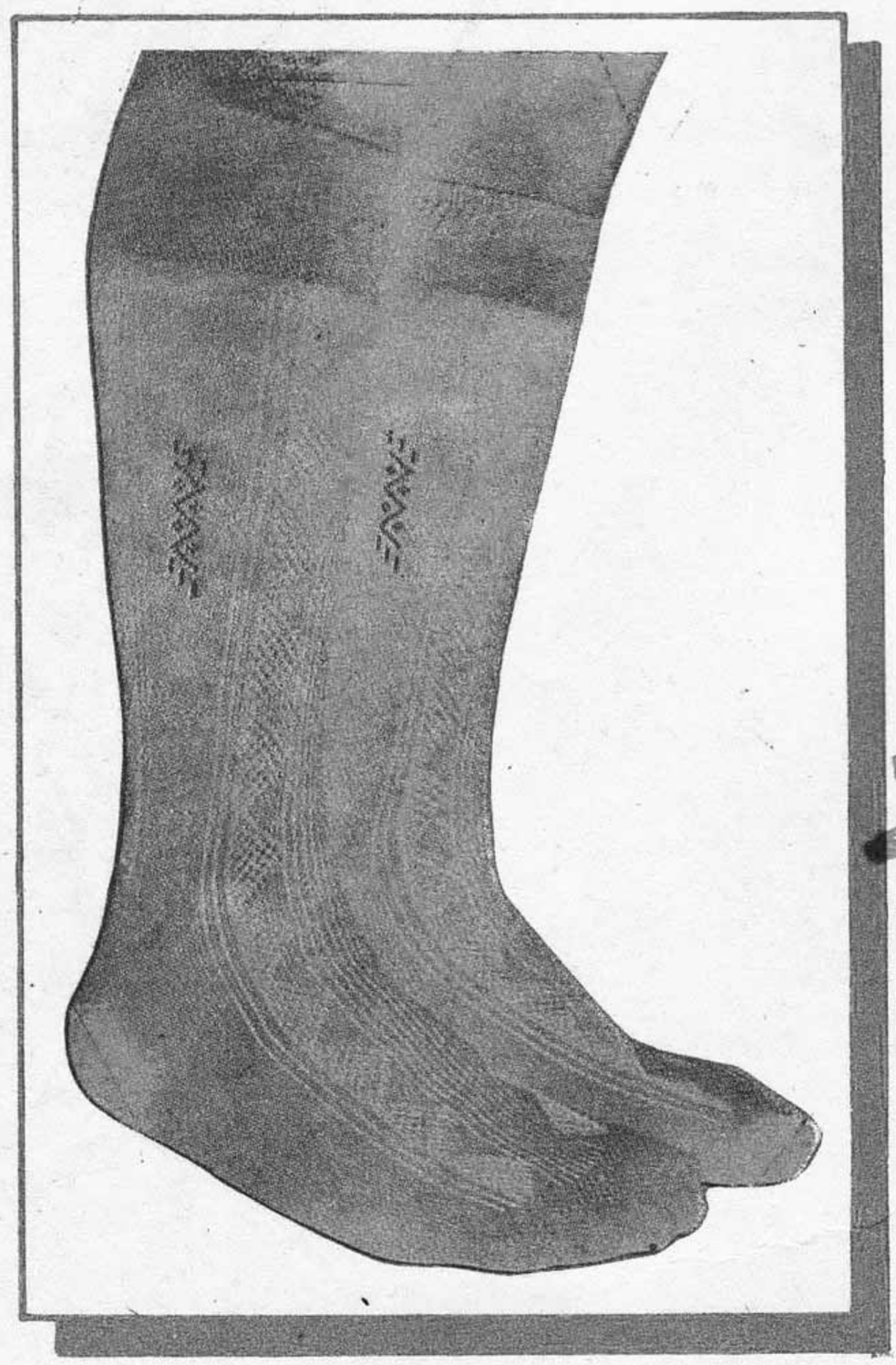

Chand SOCKS

চান্দ হোসিয়ারী মিলস

৩০, শাখারী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা–১২০৪

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩ যদুনাথ বসাক লেন (টিপু সুলতান রোড), ঢাকা হতে মুদ্রিত।